সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৫৯ ॥ সংখ্যা ১-২ ॥ ফাল্গুন ১৪৩০ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Vol. 59 | No. 1-2 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রূপে-রূপান্তরে ছোটগল্পের জগদীশ গুপ্ত

Volume	59
Issue	1-2
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাবিহা নূর জামিন
Published online	December 31, 2024
DOI	10.62328/sp.v59i1-2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i1-2.9
Pages	177-203
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩০ ॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০২৪
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i1-2

DOI: 10.62328/sp.v59i1-2.9
প্রবন্ধ জমাদান: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ৫ মে ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৭৭-২০৩

রূপে-রূপান্তরে ছোটগল্পের জগদীশ গুপ্ত

সাবিহা নূর জামিন
প্রভাষক, বাংলা, উত্তরা হাই স্কুল এন্ড কলেজ
ইমেইল: trishna5feb@gmail.com

সারসংক্ষেপ

জগদীশ গুপ্ত বাংলা কথাসাহিত্যের ব্যতিক্রমধর্মী লেখক। তাঁর রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প বাংলা কথাসাহিত্যের ঐতিহ্যে স্বতন্ত্র সৃষ্টির মর্যাদালাভ করেছে। উল্লেখ্য, যেকোনো সাহিত্যস্রষ্টার আজীবন সাধনার লক্ষ্য থাকে প্রচলিত ঐতিহ্য থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠার। বাংলা কথাসাহিত্যের অধিকতর প্রতিষ্ঠার কালে অগ্রজ বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র থেকে তিনি নিজেকে পৃথক করতে পেরেছিলেন। এমনকি, যে কল্লোলের কালে তাঁর লেখকচৈতন্যের উদ্ভব ও বিকাশ, সেই কল্লোলীয় লেখকদের সঙ্গে সানুরাগ সংযোগ সত্ত্বেও নিজেকে পৃথক রাখতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য সামনে রেখে তাঁর ছোটগল্পের বিষয় ও শৈলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। উক্ত পর্যালোচনায় জগদীশ গুপ্তের লেখককৃতি অন্বেষণে পূর্ববর্তী গবেষক-সমালোচকদের মত পরীক্ষা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নিজস্ব অন্তরঙ্গ পাঠের নানা দিক। উক্ত পর্যালোচনায় জগদীশ গুপ্তের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব, ফরাসি বাস্তববাদ ও প্রকৃতিবাদ এবং প্রাচ্য সমাজকাঠামোয় অধিকতর দৃশ্যমান নিয়তিবাদী ধারণার সাজুয্য অনুসন্ধান করা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর গল্পের শৈলী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে পাঠনির্ভর আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। উক্ত পর্যালোচনার নিরিখে বাংলা ছোটগল্পের ধারায় জগদীশ গুপ্তের রচনার রূপ-রূপান্তর অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

মূলশব্দ

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত, প্রকৃতিবাদ, বাস্তবতাবাদ, নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি, মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব, কৌতুকরস, যৌন অপরাধ, আলংকারিক শব্দবৈচিত্র্য।

বাংলা কথাসাহিত্যের ভিন্ন মাত্রার স্রষ্টা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) ছোটগল্প পর্যালোচনায় নবীন এই শিল্পরূপের অভিনব রূপকার হিসেবে তাঁর কৃতি নিরূপণে ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকানো প্রয়োজন অনুভব করি। আমাদের দেশে লোককথার নানান আঙ্গিকে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ছোটগল্পের একটা প্রত্নরূপ থেকে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) হাত ধরেই এই শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রথম যুগের বাংলা ছোটগল্প কোনো লৌকিক আঙ্গিক-আশ্রিত, না রবীন্দ্রচেতনায় প্রবাহিত ইউরোপীয় মনীষার অভিঘাত? নাকি উভয়ের সমীভবন? আপাতত এই প্রশ্নে ভাবনার ইঙ্গিতটুকু এখানে হাজির থাকল। এর সুরাহা আমাদের কাছে ভিন্ন আয়োজনের ব্যাপার হয়েই থাক। দেশীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বজনের সখা রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি ও হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ পরিক্রমায় বৈচিত্র্যের ঐক্যে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁর জীবন থেকে এই শিক্ষা আমরা পাই। তাঁর জীবন ও সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে এই সত্য মাথায় রেখে বাংলা ছোটগল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করলে আমাদের সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত নবীন এই শিল্পের রূপান্বেষণ সহজতর হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা ছোটগল্পের স্রষ্টা, তেমনি এর রূপ-স্বরূপ নিয়েও পরোক্ষে তাঁর চিন্তার পরিচয় আমরা পাই। তাও আমরা অনুভব করি, আজ পর্যন্ত ছোটগল্পের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞার্থের সংকট। এ থেকে বোঝা যায়, ছোটগল্প হতে পারে বিচিত্র রকমের। সার্থক ব্রিটিশ কথাশিল্পী ও সাহিত্যের রূপাঙ্গিকের নিবিষ্ট চিন্তক এইচ জি ওয়েলস (১৮৬৬-১৯৪৬) ছোটগল্পের সংজ্ঞার্থ নির্মাণ করেছেন এভাবে:

> ... a short story is, or, should be a simple thing; it aims at producing one single vivid effect; it has to seize the attention at the one, and never releasing, gather it together more and more until the climax is reached. The limits of human capacity to attend closely therefore set a limit to; it must explore and finish before interruption occurs or fatigue sets in. (1899: 17)

ছোটগল্পের লক্ষ্য এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত 'one single vivid effect', সৃষ্টি করতে হবে একটি মাত্র রসমুহূর্ত, তার সঙ্গে অন্য কোনো রসমুহূর্ত জড়িত হবে না এবং তা হবে অতি প্রত্যক্ষ জীবনানুগ। পাঠকের মনোযোগকে ছোটগল্প সূচনাতেই আকৃষ্ট করবে। কখনোই তাকে শিথিল করবে না। নির্ভুল দ্রুত পদক্ষেপে তা চূড়ান্ত ক্লাইমেক্সে উপনীত হবে এবং এই সূচনা থেকে চূড়া পর্যন্ত ঘটনাটি পাঠকের মানসিক সামর্থ্যকে অতিক্রম করে যাবে না। অর্থাৎ একই বৈঠকে উপভোগ করা যাবে। ভাবের একমুখিতা, বক্তব্যের অদ্বিতীয়তা, জীবনপ্রবাহের খণ্ডচিত্রের রূপায়ণ এবং সমস্তটার মধ্য দিয়ে লেখক-ব্যক্তিত্বের নির্ভুল প্রকাশই ছোটগল্পের মূলকথা। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য বিশ্বে ছোটগল্পের রূপান্বেষণ ও পর্যালোচনায় বিভিন্ন প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। Viorica Patea-র *Short Story Theories: A Twenty-First-Century Perspective* বইটির কথা বলা যায়। ছোটগল্পের তত্ত্বচর্চায় ব্যাপক ব্যবহৃত বইটিতে Flannery O'Connor-কে উদ্ধৃত করে Viorica Patea বলেন:

> A story is a way to say something that can't be said any other way, and it takes every word in the story to say what the meaning is. You tell a story because a statement would be inadequate. When anybody asks what a story is about, the only proper thing is to tell him to read the story. The meaning of fiction is not abstract meaning but experienced meaning, and the purpose of making

> statements about the meaning of the story is only to help you to experience that meaning more fully. (2012: 9)

এখানে ছোটগল্পকে বলা হচ্ছে এমন শিল্প যার প্রয়োজন অন্য কোনো মাধ্যমে পূরণ হয় না। ছোটগল্প এমন মাধ্যম যার কাজ বিবৃতিমূলক রচনায় সম্পন্ন হয় না। ছোটগল্প কী, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তত্ত্বীয় ধারণার চেয়ে একটি গল্প পড়ে নিতে বলা হচ্ছে, যেখানে বিমূর্ত ধারণার চেয়ে অভিজ্ঞতা গুরুত্বপূর্ণ। ছোটগল্প-পাঠে আমাদের জীবনাভিজ্ঞতা অন্য জীবনকে অধিকতর পূর্ণতায় সংযুক্ত করে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্বরূপ অন্বেষণে আমরা প্রথাগতভাবে রবীন্দ্রানুসারী। 'বর্ষাযাপন' কবিতা-সূত্রে আমরা ছোটগল্পের যে কাঠামো কল্পনা করি, 'ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা'র যে খণ্ড অভিজ্ঞতার চিত্র নিয়ে আমরা এত কাল পার করেছি, তত্ত্বীয়ভাবে তা থেকে আমাদের ধারণা বেশিদূর বদলায়নি। যদিও সৃষ্টিশীল গল্পকাররা অভিনব সব আঙ্গিকের গল্প দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন। সমালোচকের কাব্যিক সংজ্ঞার্থটি বিবেচনা করা যাক:

> বিন্দুতে সিন্ধু, চূড়ামণিযোগের স্লান মুহূর্ত, ঘটনাশক্তিতে শায়িত একটি ক্ষুদ্র নিটোল মুক্তা, ললাটলিপিতে উৎকীর্ণ এক বাক্যের একটি গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন, চোরা লণ্ঠনের আলো, ছোট প্রাণ ছোট ব্যথার আলেখ্য, ঘনান্ধকারের বিদ্যুৎঝলক নানা অভিধায় ছোটগল্পের পরিচয় দেওয়া যায়। (অরুণকুমার ১৯৯৯: ৬-৭)

উপরের সংজ্ঞার্থগুলো থেকে যা পাই তার মূলকথা সেই একই: ছোটগল্প লেখকের অভিজ্ঞতায় জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার তাৎক্ষণিক নিটোল-নিপুণ আখ্যান। আর বোঝাপড়ার বহু কাল বিস্তৃত দোলাচলে পূর্বোক্ত চরণে যা বলা হলো, তার চেয়ে হয়ত কিছু কম, কিংবা বেশি। সাহিত্যের একটি রোমান্টিক ফর্ম বা ক্রম-সাধিত রূপ হিসেবে কথাশিল্পের এই আঙ্গিকের পরিচয় এমনই হবার কথা। ছোটগল্পে লেখক জীবনকে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে দেখেন। অন্যান্য গদ্যসাহিত্যে লেখক যেমন জীবনের সামগ্রিক ধারাকে প্রতিফলিত করতে চান, ছোটগল্পে লেখক জীবনপ্রবাহের নির্বাচিত অংশে সমস্ত লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করেন। তাই ছোটগল্পের গভীরতা বেশি, প্রসার কম। দেশে-বিদেশে বিগত দুশো বছর ধরে এই শিল্পের রূপ-রীতি নিয়ে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তার আলোকে ছোটগল্পকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি, যথা: ১. স্বাদু রীতির গল্প ও ২. নিরীক্ষামূলক রীতির গল্প।

ঐতিহ্যগতভাবে ছোটগল্পের যে সরল রোমান্সধর্মী আখ্যানভাগ আমরা পেয়ে এসেছি, বর্ণনাভঙ্গিতে যে সহজতার চর্চা দ্বারা পাঠকহৃদয় জয় করতে দেখেছি, বহুকাল ধরেই কখনো তাতে অ্যাবসার্ডধর্মিতা, জটিল কাঠামো; বিষয়বিন্যাস কিংবা কলাপ্রসাধনে নিরর্থকতার কূটাভাস ইত্যাদি বিষয় গল্পের খোলনলচে পালটে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রথাগত রীতিটি টিকে আছে সবলে। এই বিবেচনা থেকেই গল্পের প্রকারে উপরিউক্ত দ্বি-রূপ প্রস্তাবনা। বিবৃত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় জগদীশ গুপ্তের গল্প অনুধাবন আমাদের অন্বিষ্ট। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের সাহিত্যতাত্ত্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা তাঁর গল্পকার-সত্তার স্বরূপ অন্বেষণ করব। উক্ত কর্মে তাঁর গল্পের বিষয় ও শৈলী পর্যালোচনার

পাশাপাশি এই ভিন্ন ধারার লেখককে নিয়ে বিগত দিনের সাহিত্য সমালোচনার গতিপ্রকৃতি বোঝারও চেষ্টা করব।

জগদীশচন্দ্র গুপ্তের লেখালেখি শুরু হয় অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে। প্রথম গল্পগ্রন্থ যখন বের হয়, তখন তাঁর বয়স ৪১। ততদিনে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তাঁর চেতনাজগৎ সমৃদ্ধ। ৯টি পূর্ণায়ত গল্পগ্রন্থ ও *স্ব-নির্বাচিত গল্প*সহ মোট ১০টি গ্রন্থে তাঁর ছোটগল্পের ভুবন বিস্তৃত। গ্রন্থগুলো হচ্ছে: *বিনোদিনী* (১৯২৭), *রূপের বাহিরে* (১৯২৯), *শ্রীমতি* (১৯৩১), *উদয় লেখা* (১৯৩৩), *তৃষিতা সৃক্কনী* (১৯৩৩), *উপায়ন* (১৯৩৫), *পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক* (১৯৩৪), *শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী* (১৯৩৬), *মেঘাবৃত অশনি* (১৯৪৮) ও *স্ব-নির্বাচিত গল্প* (১৯৫৯)। এসব গ্রন্থের গল্পে তাঁর লেখকসত্তার যে পরিচয় মেলে তা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক বিবেচনায় প্রথাবিরোধী গল্পকার হিসেবে তিনি চিহ্নিত হয়েছেন। বাংলা গল্পের পূর্ববর্তী লেখকদের সঙ্গে তুলনা করলে রীতিপ্রশ্নে তাঁকে স্বাদু ও নিরীক্ষামূলক—উভয় রীতির গল্পের মিশ্র রূপকার বলে মনে হয়। কিন্তু বিষয়বিন্যাসে তিনি স্বাদুতাকে ছাপিয়ে গিয়ে মানবচৈতন্যের পঙ্কে আলোকপাত করেছেন, যে আলোর ঝলকানিতে পাঠকের স্বাদু মন বিপর্যস্ত হয়। তিনি এমন বাস্তবকে চিহ্নিত করেছেন যা দেখতে পাঠক হিসেবে আমরা কখনোই তৈরি ছিলাম না। প্রত্যেক লেখকই তার জীবনদর্শন ও শিল্পপ্রতিভার দ্বারা সমকাল, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ের সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করতে চান। জগদীশ গুপ্ত যখন গল্প লেখা শুরু করেন, বাংলা ছোটগল্প তখন অনেকটাই পরিণত অবস্থায় ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৪) তখন স্বমহিমায় ভাস্বর এবং পাঠকমলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁস দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা বাংলা ছোটগল্পে এক মানবতন্ত্রী ও কল্যাণকামী ধারার বিস্তার ঘটিয়েছেন। আস্তিক্যবোধ ও শুভ পরিণামে বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয়। সত্যের সঙ্গে সুন্দরের সাযুজ্য রবীন্দ্রচেতনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একই মনোভাবে আস্থাশীল ছিলেন। জগদীশ গুপ্তের চেয়ে বয়সে বড় হলেও তাঁরা একই যুগে বিচরণকারী লেখক। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের মানস-প্রবণতার দূরত্ব বিস্তর। যদিও শরৎচন্দ্রের গল্পের আখ্যানভাগের মতো গ্রামীণ জীবন-সমাজ ও প্রকৃতি জগদীশ গুপ্তের রচনায়ও দেখা যায়। কিন্তু মানবমনের কুটিল, গহন অরণ্যরূপ শরৎচন্দ্রের রচনায় তেমন পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে নারীচরিত্রের নিপুণ রূপকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নারী চরিত্র গ্রামপ্রকৃতির কোমলতায় মানুষ, জটিলতা কুটিলতায় প্রবেশ তাদের প্রায় নিষিদ্ধ। এমনকি পতিতা নারীচরিত্র সৃষ্টিতেও শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, নারী পতিতা হয়েছে তার মানসিক প্রবণতার জন্য নয়, বরং এর জন্য দায়ী তার সমাজব্যবস্থা। সমাজের কিছু মানুষের জন্যই নারী সেই পথে যেতে বাধ্য হয়েছে। মূলত নারীটি সতী, অবস্থার বিপাকে তার এই বৃত্তিগ্রহণ। লেখকের মানসিকতায় এই যে একটি নৈতিক আবরণ, তাকে সরিয়ে বস্তুর বাস্তবিক চেহারাটি দেখিয়েছেন বলেই শরৎচন্দ্র থেকে জগদীশ গুপ্ত আলাদা হয়ে গেছেন। আর আজকের এমন বিবেচনায় রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদি শ্রেণিতে উপনীত। যা বাস্তব তাই জগদীশ গুপ্ত তুলে ধরতে চেয়েছেন। সামাজিক বা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে তাড়িত করেনি। সতীত্ববোধের প্রথাগত ধারণা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। ইউরোপে রেনেসাঁস-পরবর্তী

সাহিত্যধারায় মানবমনের গহীন অন্ধকারকে ফুটিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার পত্তন হয়েছিল ফিউদর দস্তয়েভস্কি (১৮২১-১৮৮১) এবং শার্ল বোদলেয়ারের (১৮২১-১৮৬৭) হাতে। এমন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা ঐতিহ্যবিরোধী এবং সমাজের চোখে অগ্রহণযোগ্য বিষয়ে বিন্যস্ত। হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত তার জগৎ। পচনশীলতা ও বন্ধ্যাত্ব তার ধর্ম। মানুষ সেখানে বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। নায়ক সেখানে আর কর্তা বা হিরো নয়, সে এন্টিহিরো। বাংলা সাহিত্যে এই ধারা জগদীশ গুপ্তের রচনায় অনেক বেশি প্রকট। তারুণ্যের শুরুতে পনেরো-ষোলো বছর বয়সে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের দেহবাদী কবিতায় আকৃষ্ট হয়ে জগদীশ গুপ্ত কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। পরিণত বয়সে কবিতা থেকে সরে এসে ঢুকলেন গল্পের জগতে। বেরোলো প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* (১৯২৭)। ততদিনে লেখকের মননে দেহবাদিতার বদলে স্থান করে নিয়েছে মানুষের জীবনে প্রথাগত শুভ-অশুভের অন্তরালবর্তী বাস্তবতার তীক্ষ্ণ নির্মোহ পর্যবেক্ষণী জীবনদৃষ্টি। এই জীবনদৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন একদিকে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্য নিয়ে পড়ালেখার ফলে। কলকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে এক বছর ও রিপন কলেজে দুবছর পড়ার সময় তৎকালীন অগ্রসর মননের ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয় ইংরেজি উপন্যাসগুলো তিনিও পড়েছেন বলে তাঁর চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৫-১৯৩৯) লেখা তিনি পড়েছিলেন। তাঁর মুদ্রিত চিঠিপত্রের মধ্যে ওয়াশিংটন আরভিং, শেক্সপিয়র, মোপাঁসা, মলিয়ের, রেমিজভ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ৫ আশ্বিন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে (১৯২৬) লেখা এক চিঠিতে তিনি বলছেন: 'রবীন্দ্রনাথ ওয়াশিংটন আরভিংকে এবং জলধর সেন মোপাসাঁকে ছাঁচে ঢেলেছেন' (জগদীশ ১৯৮২: ৬০৮)। এ থেকে বোঝা যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনামূলক পঠনপাঠন তাঁর ছিল।

জগদীশ গুপ্ত মননের দিক থেকে কল্লোলীয়দের মানসিকতার গোত্রজ ছিলেন। তবে কল্লোল যুগের লেখকরা যেমন কট্টরভাবে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যরীতির বিরোধিতা করেছেন, জগদীশ গুপ্ত তা করেননি। ভীষ্মদেব চৌধুরীর মতে: 'কথাসাহিত্যের জগতে জগদীশের আবির্ভাব কিন্তু বিরোধ প্রতিরোধের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত নয়' (১৯৮৮: ১১)। আর জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মূল্যায়ন: 'বয়েসে কিছু বড়, কিন্তু বোধে সমান তপ্তোজ্জ্বল। যৌবন যে বয়সে নয়, মনের মাধুরীতে, জগদীশ গুপ্ত তাঁর আরেক প্রমাণ' (১৯৫৩: ২৬০)। জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে কল্লোল গোষ্ঠীর মিল হলো, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও মতবাদ বিষয়ে অন্যদের মতো জগদীশ গুপ্তও সচেতন ছিলেন। তবে কল্লোলীয় লেখকদের মতো রোমান্টিক বিদ্রোহ তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর গল্পগুলোর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে নিষ্ঠুর বাস্তবতা, নির্মম ও নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার যেসব সমস্যা পাওয়া যায় তা ব্যক্তির মনকে কীভাবে প্রভাবিত করে, ছোটগল্পের চরিত্র তৈরির মাধ্যমে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। অধঃপতিত মানুষের গ্লানি, বিকার, বেদনার সঙ্গে রোমান্টিকতাকে মিশ্রিত করে জগদীশ গুপ্ত কল্লোল গোষ্ঠীর পথ অনুসরণ করেননি। তিনি গল্পগুলোতে তুলে ধরেছেন মানুষের ভেতরকার অবদমিত বাসনা, স্বার্থবুদ্ধি ও চক্রান্তের বাস্তব চিত্র। মাঝে মাঝে নিয়তি ও যৌনপ্রবৃত্তিকে সমস্ত শাসনের ঊর্ধ্বে এক অবারিত শক্তির প্রকাশ হিসেবে দেখিয়েছেন। জগদীশ গুপ্তের গল্পে যৌনতার প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণরূপে দেহবাদী গল্পকার বলা

যায় না। মুরলীধর বসুকে লেখা জগদীশ গুপ্তের নিজের একটি পত্র থেকে ছোটগল্পের বিষয় সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত পাওয়া যায়:

> শুধুমাত্র সামাজিক ঘটনা লইয়া গল্প লিখিবার রেওয়াজ যখন ছিল তখন একথা বলা চলিত কিন্তু এখন সে কায়দা নাই। উন্মুখ প্রবৃত্তি লইয়াই এবং মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়াই এখন গল্প লেখা চলিত হইয়াছে। কাজেই মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তির সঙ্গে যার যত পরিচয় বা সেই বিষয়ে যার যত অন্তর্দৃষ্টি, তার গল্প তত বিচিত্র হইবে। (জগদীশ ১৯৮২: ৬১৯)

এছাড়াও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকরা নগর-কেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতা নিয়ে লিখেছেন, যা জগদীশ গুপ্তের লেখায় অনেক কম পাওয়া যায়। মানুষের একাকী জীবনের যন্ত্রণা, আধুনিক জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, বিযুক্তির ধারণা, অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বকে কল্লোলীয়রা তাদের আখ্যান-বিন্যাসে তুলে ধরেছেন। আর জগদীশ গুপ্ত আবিষ্কার করতে চেয়েছেন মানবমনের যে গহীন প্রদেশে হিংস্রতার জন্ম হয় তার বৃত্তান্ত। কল্লোলীয়দের থেকে আস্তে আস্তে জগদীশ গুপ্তের রচনা আলাদা হতে থাকে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) পূর্বসূরী হিসেবে জগদীশ গুপ্তকে দেখানোর প্রবণতা আছে আমাদের সমালোচনা-জগতে। মানিকের প্রথম পর্বের সাহিত্যে (১৯৩৫-১৯৪৭) নিয়তিবাদ, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এছাড়া নির্মোহ-নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি জগদীশ গুপ্তের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আস্থাশীল ছিলেন। নিচু তলার মানুষের প্রতি এই লেখকদ্বয়ের আগ্রহ লক্ষণীয়। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের তাৎক্ষণিক ও তথাকথিত বোধের বাইরে দাঁড়িয়ে জগদীশ গুপ্ত গভীর জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনস্তাত্ত্বিক গল্পগুলোর বেশির ভাগই প্রবৃত্তিতাড়িত আদিম যৌন কামনা-বাসনা বিষয়ক। ফ্রয়েডের ভাষায় একে বলে লিবিডো। লিবিডো তৈরি করে বহু বিচিত্র মনোবিকলন। শারীরিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে নারী-পুরুষের মনোবিকলন বা মনের সর্পিল অবস্থাকে ধরতে চান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ (১৯৩৭), ‘টিকটিকি’(১৯৩৮), ‘শৈলজা শিলা’ (১৯৩৮) প্রভৃতি গল্প ধরলে বোঝা যায় এই ক্ষেত্রে তাঁদের সাদৃশ্য রয়েছে। দুজন কাছাকাছি বিষয়ের রূপকার। প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রথাগত মূল্যবোধের ভাঙন দেখানো দুজনেরই উদ্দেশ্য। তবু লেখক হিসেবে জগদীশ গুপ্ত ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেননি। মানুষের জীবনব্যাপী যে শুভ প্রয়াস, তা এক অন্ধ নির্মম শক্তির কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেখিয়েছেন পরাজিত মানুষকে। ব্যক্তির এই অসহায়তার পরিচয় তাঁর গল্পপাঠে পাঠক পেয়ে যায়। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে কুলহারা মানুষের অসহায়তার পাশাপাশি আছে তাদের কঠিন সংগ্রামী জীবনের পরিচয়। ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্যের তাৎক্ষণিক ও তথাকথিত বোধের বাইরে দাঁড়িয়েই তিনি গভীর জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন। মানবজীবনের হতাশা, ব্যর্থতা, প্রাপ্তি ও বঞ্চনার আড়ালে তিনি দাঁড় করিয়েছেন এক নির্মম শক্তিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো আশাবাদী সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের কঠোর বাস্তববাদী নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যপাঠে বিচলিত বোধ করেছেন:

> সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণ বাহুল্যে অতি মাত্রায় রাঙিয়ে তোলায় যত বড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে, সেন্টিমেন্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল করে তুললে অবাস্তবতা তারচেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়েলিজমের নাম দিয়ে এ কালের সৌখিন আধুনিকতাকে খুশি করা অত্যন্ত সহজ। যেটা সহজ, সেই তো আর্টের বিপদ ঘটায়। (রবীন্দ্রনাথ ১৯৮২: ৬৩৮)

তবু তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *বিনোদিনী* (১৩৩৪) প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে প্রশংসাসহ জগদীশ গুপ্তকে লেখেন: 'ছোটগল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় উপস্থিত দেখিয়া সুখী হইলাম' (রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯: ২২২)। তাঁর গল্পের এই রূপ ও রস নিয়ে নানামুখী আলোচনায় জগদীশ গুপ্তের লেখক-চৈতন্যের হদিস সবার কাছে সমানভাবে ধরা দেয়নি। তাঁর সাহিত্যদৃষ্টি পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন। সমালোচক আবদুল মান্নান সরকারের পর্যবেক্ষণ লক্ষণীয়:

> জগদীশ গুপ্ত তাঁর ছোটগল্পে আমাদের গ্রামীণ জীবনের স্বাভাবিক নকশাটিই গ্রহণ করেছেন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-ভগিনী এবং পাড়াপড়শি নিয়ে সম্পর্কের কাঠামোটি চির পরিচিত ও পুরাতন। কিন্তু এই সাংসারিক ও সামাজিক সম্পর্কের অন্তরালে চিরকাল ধরে চলছে যে অশুভ চিন্তা ও কর্মকোলাহল, বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক অভিপ্রায়ের নিয়ত প্রবাহ—এই অনাবিষ্কৃত জগৎই জগদীশ গুপ্তের গল্পের মূল প্রতিপাদ্য। অভ্যস্ত জীবনযাত্রার পেলব সম্পর্ক, সাংসারিক জীবনের আনন্দিত অধ্যায় তাঁর গল্পে আসেনি, তা নয়। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সুখের আয়োজন যেন মানুষের পরবর্তীকালের অসহায়ত্বকে তীব্র তীক্ষ্ণ ও গভীর করে তোলার জন্যই। (সরকার আব্দুল ২০০১: ১১৮)

সমালোচকের এই উক্তিটি পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। উদ্ধৃতিটির প্রথমাংশ জগদীশ গুপ্তের গল্পের কাঠামো সম্পর্কে প্রশংসনীয় হলেও শেষ লাইনটি নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, লেখকের গল্পে সুখের আয়োজন পরবর্তীকালের অসহায়ত্বকে তীব্র তীক্ষ্ণ করে তোলার কার্যকারণে উপস্থাপিত কি না। এমন কার্যকারণ তিনি অন্বেষণ করেছেন বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে রিয়ালিজমের উপস্থাপক লেখকের বৈশিষ্ট্যও এমন নয়। উনিশ শতকের ফরাসি দেশে রিয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদের চর্চায় বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন। বলা যায়, চিত্রকর Gustave Courbet-Gi L'Origine du monde চিত্রের কথা। এক তুর্কি কূটনীতিকের ফরমায়েশে চিত্রিত ছবিটির বিষয়বস্তু যৌনতৃপ্ত এক নারী অনাবৃত যোনী এলিয়ে শুয়ে আছে। শিল্পীর তৈলচিত্রে বিবৃত ছবিটি নিয়ে পরবর্তীকালে সিনেমাও তৈরি হয়েছে। তবে চিত্রীকে উক্ত চিত্রের প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই অধিক সইতে হয়েছে। শিল্প এমন এক মাধ্যম যা বাস্তবকে তুলে ধরে সম্ভবপর অনুপম নিষ্ঠায়। সেখানে সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি-ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণে উঠে আসে। কিন্তু ধর্ম-নৈতিকতার বাঁধনে তাকে বাঁধতে গেলে শিল্প গুরুত্ব হারায়। কথিত নৈতিকতা বা শুভ-অশুভের বাঁধন থেকে শিল্পের মুক্তির প্রশ্নেই পাশ্চাত্য বিশ্বে রিয়ালিজমের সূচনা হয়। এমন শিল্পান্দোলনে জীবনে যা ঘটে অবিকল তা তুলে আনাই মুখ্য হয় শিল্পীর কাছে। জীবন মানে ভালো-মন্দ উভয় ধারণার দৃঢ় উপস্থিতি। শুভকে যেভাবে আমরা শিল্পে উপস্থান করি, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের ধারণা বা অন্বেষণ শিল্পে যেভাবে আমরা প্রত্যাশা করি, সেরূপ নীতিবাগিশ মনোভাব থেকে সাহিত্যকে

আলাদা করে আনবার দৃষ্টান্তও দেশে দেশে কালে কালে আমরা লক্ষ করি। বিশ শতকের শুরুর দিকে রবীন্দ্রচৈতন্যের কল্যাণবোধ যখন বাঙালি পাঠককে আবিষ্ট করে রেখেছে, সমকালীন অন্যান্য লেখক যখন আধুনিকতার মোহে বিষয় ও প্রকরণে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরির কৃতিত্ব গড়ছেন, তখন জগদীশ গুপ্ত অবলম্বন করলেন রিয়ালিজমের নির্মোহ পথ। তিনি তাঁর কোনো রচনাতেই নিজের বিশ্বাস-ব্যক্তিত্ব-পছন্দকে গল্পের কোনো চরিত্রের ওপর আরোপ করেননি। সুন্দরের মতো অসুন্দর মানবজীবনের অপর পিঠ। সেই অপরতার খোলনলচে উলটে-পালটে দেখার চেষ্টা করেছেন তিনি। নিজের রচিত সাহিত্যকর্ম থেকে লেখকের নিজের ব্যক্তিত্ব আড়াল করতে পারা বিশেষ কৃতিত্ব বলেই গণ্য। উক্ত বিবেচনায় জগদীশ গুপ্তের রচনা পাঠ করলে সমালোচক সরকার আবদুল মান্নানের উদ্ধৃত পর্যবেক্ষণ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না।

'Realism' বা 'বাস্তবতাবাদ' কথাটি ১৮৫০-এর দশকে ফ্রান্সে প্রথম সাহিত্য ও সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় জীবনের রূঢ়-কঠিন বাস্তবতার চিত্রণ বোঝাতে। জগৎ-জীবন ও প্রকৃতিকে বাস্তবনিষ্ঠ ও যথার্থরূপে চিত্রিত করা বাস্তবতাবাদের মূল উদ্দেশ্য। ফরাসি সাহিত্যে ফ্ল্যবেয়ার, বালজাক এবং মোপাসাঁ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের রচনার মধ্যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেছে। ফ্রান্সের বাইরে এই জাতীয় রিয়ালিজম-নির্ভর রচনার প্রভাব পড়েছিল টলস্টয়, গোগোল এবং গোর্কির মধ্যে। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাসঙ্কুল বাস্তবতাকে গভীর ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা। বিশ শতকে এসে রিয়ালিজমের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে নর্ম্যান মেলারের দি নেকেড অ্যান্ড দি ডেড (১৯৪৮) এবং জেমস জোনসের ফ্রম হিয়ার টু ইটার্নিটি (১৯৫১) উপন্যাসে। এঁরা উপন্যাসে ইন্দ্রিয়গত রোমাঞ্চ বা Sensationalism আনার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিবর এবং তৎপরবর্তী বেশ কয়েকটি উপন্যাসে সমরেশ বসুর মধ্যে এই ঝোঁক দেখা যায়।

'বাস্তবতাবাদ' বা 'রিয়ালিজম'-এর চরম রূপ হচ্ছে 'প্রকৃতিবাদ' বা 'Naturalism'। ন্যাচারালিস্ট লেখকেরা সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্যোগ, মানুষের জীবনের অসহায়তা, কামনা-বাসনার উত্তেজনা এবং ইন্দ্রিয়াতুর ব্যাপারগুলো একেবারে স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রিত করতে চান। এ থেকেই প্রকৃতিবাদ বিকশিত হয়। প্রকৃতিবাদী সাহিত্যে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুর যথাযথ রূপায়ণ করা হয়। সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্যোগ, মানবজীবনের অসহায়তা, কামনা-বাসনা, উত্তেজনা ও ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতাকে একেবারে স্পষ্ট ও বাস্তবসম্মতভাবে চিত্রায়ণ করেন ন্যাচারালিস্ট সাহিত্যিকেরা। বিখ্যাত ফরাসি ন্যাচারালিস্ট এমিল জোলার 'The experimental novel' (১৮৯৩) প্রবন্ধে ব্যক্ত অভিমত অনুযায়ী বলা যায়: জীবনের সত্যকে দার্শনিকভাবে মেনে নেওয়া নয়, ঘৃণা প্রেম প্রভৃতি অনুভূতি মানুষের মধ্যে কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণ করে দেখানোই এ কালের উপন্যাসের লক্ষ্য। জোলার বিশ্বাস ছিল—'one and the same determinism must govern the stone in the road and the brain of man' (Zola: 1893: 28). মানুষের চৈতন্য ও বস্তুজগত সম্পর্কে জগদীশ গুপ্ত এমিল জোলার মতোই বিশ্বাসী। ফলে বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে,

জগদীশ গুপ্তকে প্রকৃত ন্যাচারালিস্ট শিল্পী বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের রচনা গভীর জীবনানুসন্ধানী।

মানবজীবন তার অন্তর্নিহিত বোধ ও প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। সে কারণেই জগদীশ গুপ্ত মূলত ব্যক্তির মানস-চেতনার গভীরে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়েছেন। আলোচনার সুবিধার্থে সৃষ্ট চরিত্রের বিশিষ্টতার নিরিখে তাঁর গল্পগুলোর কিছু বিভাজন করা যায়: ক. যৌন-আসক্তি ও যৌন-জটিলতা বিষয়ক; খ. যৌন-অপরাধমূলক; গ. নিষ্ঠুরতা ও হত্যা-কেন্দ্রিক; ঘ. অপ্রকৃতিস্থ চরিত্র-কেন্দ্রিক; ঙ. রোমান্টিক ও কৌতুকরস-ভিত্তিক; চ. নিষ্ঠুর নিয়তি ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ-কেন্দ্রিক।

ক. যৌন-আসক্তি ও যৌন-জটিলতা বিষয়ক গল্প

জগদীশ গুপ্তের গল্পে যৌনতার কোনো বর্ণনা নেই। কিন্তু লিবিডো-চেতনার বিবিধ রূপ ও জটিলতা তাঁর গল্পের প্রধান বিষয়। শরীরের প্রসঙ্গ তাঁর গল্পে কখনোই আরোপিত বলে মনে হয় না। অনেক গল্পে যৌনপ্রবৃত্তি চরিত্রের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করেছে। মানুষের অন্তরালের অনাবিষ্কৃত যৌন-জগৎকে পাঠকের সামনে উন্মোচন করেছেন তিনি। যৌন চাহিদার অচরিতার্থতা, অবদমিত কামনা-বাসনা প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে চরিত্র-কেন্দ্রিক গল্পগুলোতে। এ বিষয়ক উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে 'আশা এবং আমি' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'অপহৃত আকাশ কুসুম' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*), 'আদি কথার একটি' (*রূপের বাহিরে*), 'অরূপের রাস' (*রূপের বাহিরে*), 'মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল' (*পাইক মিহির প্রামাণিক*), 'আঁধার বৃন্দাবন' (*রূপের বাহিরে*), 'লোকনাথের তামসিকতা' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'নিষ্ঠুর গরজী' (*রূপের বাহিরে*), 'জহর' (*রূপের বাহিরে*), 'প্রলয়ংকরী ষষ্ঠী' (*বিনোদিনী*), 'অনুপান' (*শ্রীমতি*), 'রসাভাস' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*), 'জ্ঞানাঙ্কুর' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*)।

'আশা এবং আমি' গল্প প্রতিবেশী কুমারী ষোড়শী আশার প্রতি মুখ্য চরিত্র বিভূতির শারীরিক আকর্ষণ দিয়ে শুরু। আশার প্রতি তীব্র আকর্ষণকে সে দার্শনিক ভঙ্গিতে বিচার করার চেষ্টা করে: 'ভাবিয়া দেখিয়াছি, সামগ্রীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া পাওয়ার লোভ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। মানুষের মনে চিরকাল তা দুর্বার হইয়া অবস্থান করে' (জগদীশ ১৯৭৭: ১৯১)। আশাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর বিভূতির আগ্রহ ফিকে হয়ে আসে। আশাকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করার পর তার অনুভূতি হয় যে, আশা এখন নিঃস্ব; অসাড়। আশার প্রতি বিতৃষ্ণার কারণ বিচার করতে গিয়ে সে বোঝে যে, মানুষের দৈহিক আকর্ষণ শীঘ্রই পুরানো হয়ে যায়। তখন বিভূতি আবিষ্কার করে মানব-চরিত্রের আরেকটি আকাঙ্ক্ষা। আর তা হলো মানুষ নতুনত্ব চায়। দেহ এই নতুনত্ব সৃষ্টি করতে অক্ষম। কিন্তু বুদ্ধি এই দেহকে নিত্য নতুন করে উপস্থাপন করে। আশা বুদ্ধিহীনা। তাই সে আর বিভূতিকে আকর্ষণ করতে পারছে না, 'আশার কেবল দেহই আছে, আর কিছুই নাই। খালি দেহকে অবলম্বন করিয়া মানুষ তিষ্টিতে পারে কতক্ষণ?' (জগদীশ ১৯৭৭: ১৯৪)। এমন ঘটনা আমাদের জীবনে ও সমাজে নেহায়েত কম নয়। কিন্তু যে উপায়ে লেখক এই গল্প আমাদের শুনিয়েছেন, তা শুনতে বাঙালির মন তৈরি ছিল না। এখানে ঘটনার রগরগে বর্ণনা নেই। নেই

কামনা-বাসনার দেহজ উপস্থাপন। কিন্তু লেখকের উপস্থাপনগুণে গল্পটি আমাদের সচেতন মনে তৈরি করে মানবজীবনের অন্দরে লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তিঘটিত স্তব্ধতাবোধ।

'অপহৃত আকাশ কুসুম' গল্প পুরুষের আত্মসমীক্ষণ ও মনোজিজ্ঞাসার নিদর্শন। উল্লাস চৌধুরী নামক চরিত্রের আত্মজিজ্ঞাসা, 'তবে কি আমি বুড়ো হয়েছি?' (জগদীশ ১৯৭৭: ৭৬)। উক্তিটি গল্পের মুখ্য নিয়ন্ত্রক, গল্পের শেষও এই চরণে। তেরো বছর বয়সে নয় বছর বয়সের মানিনিকে বিয়ে করার পর এখন তার বয়স একচল্লিশ। আঠাশ বছরের বিবাহিত জীবন হলেও, 'এখনো উল্লাসের ধ্যান ভাঙ্গে নাই' (জগদীশ ১৯৭৭: ৬৯)। কিন্তু একদিন কন্যা মালতির সদ্যোজাত পুত্রকে দেখার জন্য বেরিয়ে পথে এক সুদর্শনা নারীকে দেখতে পায়। কিন্তু তার মনে কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রমণী চিরকালই রমণের সামগ্রী। উল্লাস চৌধুরীর মনে হয়েছিল, সে চিরযুবা। কিন্তু এ ধারণা বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মানসিক জটিলতা শুরু হয়। সুন্দরী নারীকে নির্জন স্থানে একাকী দেখে মনে চঞ্চলতা অনুভূত না হওয়ায় উল্লাস চৌধুরীর মধ্যে দেখা দিয়েছে হতাশা। আর সেটাই তার আত্মজিজ্ঞাসার কারণ। 'আদি কথার একটি' গল্পেও মূলত পুরুষের যৌনপ্রবৃত্তির আদিম প্রকাশ ও তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। গল্পে কাঞ্চনের পাঁচ বছর বয়সী কন্যা খুশিকে তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবক সুবল বিয়ে করে কেবল বিধবা কাঞ্চনের প্রতি আকর্ষণ থেকে। কাঞ্চনের কাছে বিষয়টি অজ্ঞাত থাকলেও একদিন কোমরের ব্যথার বাহানা করে সুবল শাশুড়ির হাত ধরে টান দেয়। ঘটনার আকস্মিকতায় শাশুড়ি কাঞ্চনের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং কাঞ্চন সুবলকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। পরমুহূর্তেই আবার লেখক যেভাবে কাঞ্চনের মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তার নির্জ্ঞান মনের অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ফুটে উঠেছে:

> সেই অপার শূন্যতার আর্তশ্বাস কোথা হইতে আজ এমন অপার বেগে ছুটিয়া আসিয়া আঘাতে আঘাতে তার ভিত্তি পর্যন্ত টলাইয়া দিতে চাহিতেছে। ভয়ে কাঞ্চনের বুক শুকাইয়া উঠিল। (জগদীশ ১৯৮২: ১২৩)

সুবল ভেবেছিল তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাবে। কিন্তু কাঞ্চনের কাছ থেকে পায় সহানুভূতি। কাঞ্চনের দোলাচল মনোবৃত্তির মধ্যে তার অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে ওঠে। এমন পরিস্থিতিকে তুলনা করা যায় সিগমুন্ড ফ্রয়েড কথিত Oedipus complex-এর সঙ্গে। মনোচিকিৎসক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের আবিষ্কার সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা মনঃসমীক্ষণ বা সাইকো-অ্যানালিসিসের সঙ্গে শিল্পসমালোচনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে ফ্রয়েড-উত্তরকালে। কারণ মানবমনের অভীপ্সা পর্যবেক্ষণ করে মনের গভীরতম প্রদেশের আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করা উভয় ধারণার লক্ষ্য। ফ্রয়েড শিল্প সম্পর্কে সামগ্রিক কোনো আলোচনা করেননি। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য তিনি সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের জীবনী থেকে প্রায়ই উদাহরণ গ্রহণ করেছেন। কারণ এই পদ্ধতিতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে উদাহরণ নেওয়ার মতো তখনও কিছু ছিল না। ফলে তিনি বেশির ভাগ উদাহরণ সাহিত্য, শিল্প থেকেই নিয়েছেন। মানসিক উদবায়ু বা সাইকো-নিউরোসিস রোগের মূল কারণ যৌনবৃত্তি-সম্পর্কিত জটিলতা বলে তিনি মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে উল্লেখ করেন। *The*

Interpretation of Dreams (1900) গ্রন্থে স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের কল্পনাবৃত্তির পরিচয় দিতে গিয়ে ফ্রয়েড বলেন:

> Shakespeare's Prince Hall cannot rid himself of the Temptation to see how the Crown fits, even at the bedside of his sick father. (1900: 96)

শিল্পসৃষ্টির মূলে স্রষ্টার শিশুকালের অভিজ্ঞতা সক্রিয় থাকে। শৈশবাবস্থায় শিশু তার মানসিক স্তর পরম্পরায় oral, anal, genital পর্যায়ের মধ্য দিয়ে Oedipal পর্যায়ে চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। এই পর্যায়গুলো অতিক্রম করে গেলেও পরবর্তীকালে এর প্রভাব একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। এই সময়ের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কল্পনাসৃষ্টি এবং খেলার মধ্যে লক্ষ করা যায়। বয়ঃসন্ধিকালে যখন দৈহিক পরিবর্তন এবং যৌনপ্রবৃত্তির তীব্রতা সমস্যার সৃষ্টি করে, কল্পনাপ্রবণতা এই সময় সক্রিয় হয়ে ওঠে। বোধহয় শিল্পচেতনার অঙ্কুরোদগম হয় এই সময়ই। সাহিত্য রচনাকালে সাহিত্যিক প্রেরণা নামক যে উত্তেজনার চাপ অনুভব করেন তার মূল অবচেতন বা নির্জ্ঞানের গভীরে নিহিত। মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বে অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ব্যক্ত রূপ হিসেবে Delusion বা চরিত্রের ভ্রান্তি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে শিশু বংশানুবৃত্তির মতোই বহন করে নিয়ে আসে দ্বিমাত্রিক প্রকৃতি। এর প্রথমটি সর্বরতিময়তা বা Eros এবং দ্বিতীয়টি মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা বা Thanato। সর্বরতিময়তা মানবমনের মূল প্রেরণা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এই তত্ত্বে। যৌন-আকর্ষণ এখানে একটি স্বতন্ত্র সাময়িক উত্তেজনার ঘটনা হিসেবে বিশ্লেষিত না হয়ে মানবমনের মূল প্রেরণার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে। Thanato বা মৃত্যুপ্রবৃত্তি মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিগুলোর একটি। মৃত্যু কেবল শাশ্বত ঘটনা নয় বরং মানবমনের মৌলপ্রবৃত্তি মৃত্যুচেতনা থেকে জাত। সাহিত্যের চিত্রিত চরিত্রগুলোর মৃত্যুচেতনা রূপে একে ব্যাখ্যা করা যায়। হত্যা এবং আত্মহত্যা এর সঙ্গে জড়িত। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের এরূপ ব্যাখ্যা-সূত্রে শিল্প-সাহিত্য ও লেখক-পাঠক মিথস্ক্রিয়ায় সামাজিক মানুষের চৈতন্যের উদ্ভাস ঘটে:

> শিল্পী-সাহিত্যিকগণ, সূক্ষ্ম অনুভব ক্ষমতার সাহায্যে নির্জ্ঞানের গহনজাত নানা বৈচিত্র্য তাদের রচনায় প্রকাশ করেছেন সত্য কিন্তু নির্জ্ঞান মনের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এ সম্পর্কে বিধিবদ্ধ সুশৃংখল পদ্ধতির চিন্তাধারা গড়ে ওঠেনি। বৈজ্ঞানিক সূত্র দ্বারা বিষয়টি দৃঢ় যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত হওয়ায় একই সঙ্গে রসস্রষ্টা এবং রসিক সম্প্রদায় গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী মানসিকতার দ্বারা একে গ্রহণ করেছেন। (প্রবীরকুমার ২০০৯: ২৪)

বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিকচরিত্র বিশ্লেষণ শুরু হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ উপন্যাস থেকে। Franz Mesmer (১৭৩৪-১৮১৫) প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকদের কাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল। *বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বপ্ন, উন্মাদ রোগ, ভ্রান্তিদর্শন প্রভৃতি উপাদানের সহায়তায় চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় উপস্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *চোখের বালি* থেকে তাঁর প্রায় সব উপন্যাসে অতি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রীতি গ্রহণ করেছেন। বলা যায়, বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে আমাদের দেশে ফ্রয়েড সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। বাংলা কথাসাহিত্যে প্রায় সমকালে যৌন মনস্তত্ত্বমূলক রচনার বিশেষ ঝোঁক লক্ষ করা যায়। *কল্লোল*

পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), প্রমুখ লেখকের রচনায় এবং কিঞ্চিৎ পূর্বসূরি নরেশ সেনগুপ্তের (১৮৮৩-১৯৬৪) উপন্যাসগুলোতেও এই প্রবণতা সমকালীন সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। 'আদি কথার একটি' গল্পে শাশুড়ি কাঞ্চনের সঙ্গে সুবলের অন্যায্য যৌনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার পর নিগৃহীত নারী তার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ ধরতে পেরে মেয়ে খুশির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করতে থাকে; 'কিন্তু অপরিসীম অন্তর্দাহের সহিত কাঞ্চনের মনে হইতে লাগিল, মেয়েকে এই চক্ষু দেখাইবার মতো প্রবঞ্চনা আর পাপ জগতে আর কিছু নাই।' (জগদীশ ১৯৮২: ১১০)

এটি জগদীশ গুপ্তের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। যৌনবিকৃতির দ্বিমাত্রিক রূপ এখানে প্রকাশিত। একদিকে আছে সুবলের নৈতিকতার চাপহীন একরৈখিক যৌন-আকাঙ্ক্ষা। অপরদিকে কাঞ্চনের ন্যায়বোধ আর যৌন-আকাঙ্ক্ষার চাপ। পরিশেষে গ্রাম্য মাতব্বরের কাঠগড়ায় বিচারের মাধ্যমে গল্পের যে বিস্ময়কর মনোজগতের আবহাওয়া ছিল, তা লঘু করে তুলেছেন গল্পকার। গ্রাম থেকে কাঞ্চনকে প্রহার করে বের করে দেওয়া হয়। শেষের দিকে দেখা যায়, কাঞ্চনরা চিরদিনই অসহায়, নিরাশ্রয়। সমাজ তাদের পক্ষ নেয় না। তারা বিতাড়িত হয় ভদ্রসমাজ থেকে। সমাজের এই অন্যায় বিচার, নারীর প্রতি আজীবন ঘটে যাওয়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে জগদীশ গুপ্ত গল্পটিতে তুলে ধরেন। এমনিভাবে 'অরূপের রাস' গল্পে ইন্দিরাকে কেন্দ্র করে কানু ও রানুর অতৃপ্ত কামনার মনোবৈজ্ঞানিক সংকট, 'মনোভৃঙ্গ গুঞ্জরিল' গল্পে প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কের নীতির বাইরে বিয়ে-বহির্ভূত সম্পর্কের আবেগ ও মননগত সততা, 'আঁধার বৃন্দাবন' গল্পে স্বামীর প্রেম নিয়ে দুই স্ত্রীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার আখ্যান নিপুণ রূপ পেয়েছে। জমিদার অশোক বাড়ুয্যের অবৈধ যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত 'কড়ির দামে', 'লোকনাথের তামসিকতা' গল্পে পিতা লোকনাথ নিজের রূপহীনা স্ত্রীর প্রতি বিরাগবশত পুত্রবধূ নির্বাচনে বহু পথ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত অধিকতর কুরূপা এক নারী নির্বাচনের মধ্যে পিতা-পুত্রের যৌন-জটিলতার মনস্তাত্ত্বিক রূপ বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। 'চন্দ্র-সূর্য যতোদিন' গল্পে সপত্নী-বিবাদে ভারাক্রান্ত দুই নারীর মনোজাগতিক সংকট, কিন্তু সন্তানের প্রতি অপ্রকৃতিস্থ মায়ের স্বাভাবিক অপত্য স্নেহের অনুপম আখ্যান ব্যক্ত হয়েছে। সপত্নী-জনিত সমস্যা নিয়ে ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তের পূর্বেও ছিল। কিন্তু কোনো গল্পেই সপত্নী-বিবাদে যৌনতার দিকটি প্রতিফলিত হয়নি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার প্রেম ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বিনষ্ট হলে স্বাভাবিক দৈহিক সম্পর্কও যে কী রকম ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে, ক্ষণপ্রভার মানসিক বৈকল্য তার প্রমাণ। তবে সবকিছুর পরেও মাতৃত্ব সে ভোলেনি। নগ্ন অবস্থাতেও সন্তান তার বুকে ছিল। এমন জীবনদৃষ্টি, মনস্তত্ত্ব, বিষয়প্রধান গল্প আনুপূর্বিক বাংলা ছোটগল্পে বিরল।

খ. যৌন-অপরাধমূলক গল্প

পূর্বোক্ত শ্রেণিতে গল্পের যে আলোচনা করা হয়েছে তাতেও যৌন অপরাধের সামাজিক হিসাব আছে। বর্তমান আলোচনাতেও ফ্রয়েডতত্ত্বে ব্যাখ্যাযোগ্য গল্পের উপস্থিতি আছে। আসলে জগদীশ গুপ্তের গল্পের জগৎ যেহেতু মানবজীবনের অন্তরালের বাস্তব, তাই সেসব বিষয়

মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনাযোগ্য নানা জ্ঞানশাখাকে নানাভাবে সংযুক্ত করতে পারে। আমাদের কৃত বিভাগমতে যৌন-অপরাধমূলক গল্পের আওতায় আলোচনা করেছি এই গল্পগুলো: 'আহুতি' (*শ্রীমতি*), 'শঙ্কিত অভয়া' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'চিহ্ন' (*উপায়ন*), 'দ্বিতীয়' (*উপায়ন*), 'অচেনা মেয়ে' (*উপায়ন*), 'অবাক জোৎস্না' (*শ্রীমতি*), 'কল্লোল' (*পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক*), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*) ও 'অঞ্জন শলাকা' (*রূপের বাহিরে*)।

'আহুতি' গল্পে স্বামীর যৌন-অপরাধের কারণে স্ত্রীর মানসিক দহন এবং দাম্পত্য সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবার সংক্ষিপ্ত আখ্যান ব্যক্ত হয়েছে। ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত স্বামীর কৃতকর্মে স্ত্রী মাখনের জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি মনোজাগতিক বাস্তবতায় তুলে ধরেছেন লেখক। মাখনের কেবলই মনে হতে থাকে, সবাই ঘটনাটি জানতে পেরে যেন ঘৃণায় শিউরে উঠছে। এমনকি স্বামীর জন্য তীব্র অপরাধবোধে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। মূলত নীতিবোধের প্রবল চাপে তার এই মূর্ছা। আবার কখনো তার মধ্যে ঘটে delusion। মাখন দেখে একটি কালো মূর্তি বিষপান করানোর জন্য ছুটে আসছে তার দিকে। শেষ পর্যন্ত মাখনকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় রাতের অন্ধকার গহ্বরে। দুটি বিপরীতধর্মী নৈতিকতার চরিত্র গল্পটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে—সাতকড়ি, ধর্ষণ করেও যার পাপবোধ নেই; আর স্ত্রী মাখনবালা, যে স্বামীর কৃতকর্মের যাতনায় কাতর। গল্পটির আখ্যানভাগ আমাদের উইলিয়াম শেক্সপিয়রের অমর সৃষ্টি লেডি ম্যাকব্যাথের ট্রাজিক পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয়। তফাত হচ্ছে, শেক্সপিয়রিয়ান ট্রাজেডি-তত্ত্ব অনুযায়ী doing and suffering-সূত্রে ম্যাকবেথে লেডি ম্যাকবেথ ঘটনার মুখ্য নিয়ন্ত্রক ও কর্তা। আর জগদীশ গুপ্তের নারী স্বামীকে আকৃষ্ট করে রাখতে না পারার গ্লানিতে নিজের কাছে অপরাধী। তেমনি 'শঙ্কিত অভয়া' গল্পটি যৌন-আকর্ষণের তীব্রতায় ঘটা অপরাধবোধ থেকে জাত অভয়া নামক চরিত্রের মানসিক ভীতির আখ্যান। অভয়ার পাপবোধের মতো আরেকটি যৌন-অপরাধবোধে আক্রান্ত চরিত্র হলো 'চিহ্ন' গল্পের প্রীতি। যৌনতার জন্য নারীর মধ্যকার অপরাধবোধ নিয়ে লেখা গল্প 'দ্বিতীয়'। আবার 'অচেনা মেয়ে' গল্পে এই অপরাধবোধ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে এসেছে। 'আহুতি' গল্পে আছে আরেক ধর্ষক সাতকড়ির কাহিনি। 'অবাক জোৎস্না' গল্পে বাবা-মায়ের দাম্পত্য সম্পর্কের ছোট ছোট সমস্যা দেখে এবং মায়ের কঠোর অনুশাসনে বড় হয়ে কন্যা জোৎস্নার মনে পুরুষ ও দাম্পত্য-সম্পর্কের প্রতি যে আতঙ্কিত মনোভাব তৈরি হয়, গল্পকার তার স্বরূপ তুলে ধরেছেন। 'অঞ্জন শলাকা' গল্পে যৌন-অপরাধবোধ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। এটি জগদীশ গুপ্তের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি গল্প। ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারের সাহায্যে গল্পকার এখানে সরোজের মানসিক দ্বন্দ্ব, অসিতার বৈধব্যপ্রসূত অপরাধবোধ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেছেন। 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' যৌন-অপরাধমূলক শ্রেণির আরেকটি বলিষ্ঠ গল্প। এতে পুরুষের অবচেতন মানসে যে একান্ত নারীসঙ্গ-লিপ্সা অবদমিত থাকে, সতীশের মধ্যে সেই বিষয়টিই গল্পকার তুলে ধরেছেন।

গ. নিষ্ঠুরতা ও হত্যা-কেন্দ্রিক গল্প

এই শ্রেণিভুক্ত গল্পগুলো হলো: 'কাপালিক ও মহাকালী' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'ভয়ার্ত ত্রিপুরারি' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'উপলাহত প্রবাহ' (*উপায়ন*), 'পয়োমুখম' (*বিনোদিনী*), 'ঘিয়ের ধোঁয়া'

(*রূপের বাহিরে*), 'যাহা ঘটিল তাহাই সত্য' (*স্ব-নির্বাচিত গল্প*)। 'পয়োমুখম্' আগাগোড়া অর্থলিপ্সায় লালায়িত ব্যক্তিমানুষের হীন স্বার্থ-চরিতার্থমূলক গল্প। অর্থের লোভে মানুষ কতটা নিচে নামতে পারে, এমনকি হত্যা করতেও দ্বিধা করে না, তা এ গল্পের উপজীব্য। ব্যক্তির মূল্যবোধ, অপত্য-স্নেহ, সামাজিক ও পারিবারিক দায়বোধ—সবকিছুর ঊর্ধ্বে অর্থলিপ্সা তাকে তাড়িত করেছে। 'বিষকুম্ভপয়োমুখম্', অর্থাৎ 'মুখে মধু পেটে বিষ'—এই প্রচলিত সংস্কৃত প্রবচনের শেষের অংশ গল্পটির নামকরণরূপে গৃহীত হয়েছে। 'কাপালিক ও মহাকালী' গল্পটিতে বটকৃষ্ণের মানসিক গঠনে শিশুমনের অনুরূপ মা কালীর ওপর নির্ভরশীলতার চিত্র পাওয়া যায়। 'ঘিয়ের ধোঁয়া' গল্পটিও হত্যা-কেন্দ্রিক। তবে জগদীশ গুপ্তের অন্যান্য গল্পের মতো চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা এই গল্পে কম। দ্রুতগতিতে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে এখানে। মূলত আত্মহত্যা-কেন্দ্রিক সমস্যা নিয়ে গল্পটি রচিত। 'ঊর্মিলার মন' গল্পের দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ঊর্মিলা ও ললিতার আখ্যানে একজনের দুঃখ অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করার বিরূপ মানসিকতার জটিল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। Sibling rivalry অর্থাৎ মা-বাবার স্নেহ অধিক লাভ করার জন্য সহোদরদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিষয়টি স্বাভাবিক জীবনে প্রায় সব পরিবারেই লক্ষ করা যায়। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত তাকে আরো অনেক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছেন 'যাহা ঘটিল তাহাই সত্য' গল্পে এক শিশুর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে। অর্থলোলুপতা ও সম্পদতৃষ্ণা একটি মানুষের জীবনকে কীভাবে বিধ্বস্ত করে দেয় তার নির্মম আলেখ্য 'এইবার লোকে ঠিক বলে—' গল্পটি।

ঘ. সম্পদতৃষ্ণা-কাতর লোভী মানুষের স্বার্থসর্বস্বতার গল্প

উনিশ শতকের শেষদিক থেকে ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে বস্তুতন্ত্রের যে প্রবল পরিধি গড়ে উঠেছিল তার প্রত্যক্ষ ফলাফল ছিল যুদ্ধ। আর পরোক্ষ ফলাফল ঘরে ঘরে ধনতৃষ্ণা ও হাহাকার। এই ধরনের ভয়ঙ্কর পরিণতি ও নিষ্ঠুর হিংস্রতার চিত্র পাওয়া যায় জগদীশ গুপ্তের কয়েকটি গল্পে। এমন গল্পগুলো হচ্ছে: 'চার পয়সায় এক আনা' (*স্ব-নির্বাচিত গল্প*), 'রসাভাস' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*), 'পুরাতন ভৃত্য' (*বিনোদিনী*), 'মায়ের মৃত্যুর দিনে' (*স্ব-নির্বাচিত* গল্প), 'কর্ণধর পালের আগমন ও গমন' (*স্ব-নির্বাচিত গল্প*), 'পামর' (*স্ব-নির্বাচিত গল্প*), 'কুপুত্র' (*উপায়ন*)। 'চার পয়সায় এক আনা' গল্পটি গল্পকারের আর্থ-সামাজিক চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। চালের আড়তদার রজনী হাজরার শোষণ আর শোষিত কাশী-শশীর প্রতিবাদ গল্পটিতে শ্রেণিচেতনা ও অধিকার সচেতনতার পরিচয়বাহী। 'মায়ের মৃত্যু দিনে' গল্পটিতে অর্থলোলুপতার নির্মম-নিষ্ঠুর রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। একুশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে এসে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করার কাহিনি অহরহ শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত গহনা কুক্ষিগত করার লোভে নিজের মায়ের মৃত্যু কামনার মতো বিষয় নিয়ে গল্প লিখেছেন প্রায় নব্বই বছর আগে। মানবসমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ও মানবিক সম্পর্কে আস্থাহীনতার প্রকাশ ঘটেছে 'পুরাতন ভৃত্য' গল্পটিতে। এতে নব চরিত্রের মধ্য দিয়ে অর্থলোলুপ, স্বার্থপর, অবিশ্বাসী, হৃদয়হীন, ডাকাতপ্রবণ মানসিকতার বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পটির সাধারণ পাঠে নীতিহীনতার প্রতি লেখকের সমর্থনের অভিযোগ উঠতে পারে। তবে আমরা মনে রাখতে চাই, ন্যাচারালিস্ট শিল্পীদের সমাজদর্শনের কথা। সমালোচক সরোজ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য: 'রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্রের যৌথপ্রয়াসে যে সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল, সেই আবহাওয়ার বিরুদ্ধে প্রথম সার্থক শিল্পী-প্রতিবাদ জগদীশ গুপ্তের।' (সরোজ ১৯৬১: ২৬৬)

প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের গল্প-রচনার কাল প্রাচীন মূল্যবোধে আস্থাহীনতা ও গতানুগতিক সমাজ-মনস্কতার পরিবর্তনের কাল। সে যুগে সামাজিক সম্পর্কগুলোও বিপর্যস্ত। তাই দেখা যায়, অবক্ষয় ও অবিশ্বাস জর্জরিত সামাজিক সম্পর্কের ছবি নবর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি সে সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান। একই সঙ্গে তার মধ্যে আছে সততা এবং অসততা। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টর কথা মনে পড়তে পারে। কেষ্টর মধ্যে কেবল মহত্ত্ব ফুটে উঠেছে। কিন্তু মহত্ত্বের পাশাপাশি মানুষের মধ্যে নীচতাও থাকে—এই দুটি বাস্তব অনুভূতি জগদীশ গুপ্ত তুলে ধরেছেন নবর মধ্যে। বিশ্বস্ততা, আনুগত্য প্রভৃতি মূল্যবোধ স্থায়ী নয়, এদেরও পরিবর্তন ঘটে। টাকার থলি কেড়ে নেবার পূর্বে দুইবার নব বিশ্বেশ্বরকে পালাতে বলেছে। এ থেকে বোঝা যায়, এ কাজ করার সময় নবর মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকেই সে প্রাধান্য দিয়েছে। লক্ষণীয়:

> জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের কোন স্থির আদর্শে বিশ্বাসী নন—বরং তিনি মনে করেন মানুষের জৈব শরীর এবং মনের বিভিন্ন স্তরে মানবীয় ও অমানবীয় সকল বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। কখন যে কোনটির প্রাবল্য ঘটে—নিয়তিই তার নির্ধারক। 'পুরাতন ভৃত্য' এই সত্যেরই রূপায়ণ।' (সরকার আব্দুল ২০০১: ১৩০)

সমালোচকের এই মন্তব্য 'পুরাতন ভৃত্য' গল্প সম্পর্কে যথার্থ বলে মনে করি।

মানবসমাজে প্রতারণার কোনো শেষ নেই। এর রয়েছে নানা ধরন। 'এইবার লোকে ঠিক বলে' গল্পে শিবপ্রিয় একভাবে প্রতারিত হয়েছে, আবার 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী' গল্পে পাওয়া যায় প্রতারণার ভিন্ন চিত্র। গল্পটিতে বিধৃত জীবন মুসলিম সমাজ থেকে গৃহীত। রূপতৃষ্ণা-কাতর সদু খাঁর পরস্ত্রী-হরণকে কেন্দ্র করে এই গল্পের কাহিনি নির্মিত হয়েছে। এই গল্পের ব্যঞ্জনা গল্পকারের গভীর জীবনবীক্ষারই ফল। গল্পটিতে কদর্য রূপতৃষ্ণা, ছদ্মবেশী জীবন, মানুষের যৌনবাসনা প্রভৃতি দিক রূপায়িত হলেও জসিমের বউকে উদ্ধারের কাজে সত্তর বছরের বৃদ্ধ অর্জুন নমঃশূদ্রের যে মানবিক ভূমিকা দেখা যায়, তা যাবতীয় কলুষতার বিপরীতে সাহসী, পৌরুষদীপ্ত ও মানবিকতার মহিমান্বিত আখ্যান হিসেবেই সমালোচক-মহলে অভিনন্দিত। জগদীশ গুপ্তের গল্পে এ সময় তলিয়ে যাওয়া মানুষের জীবনযন্ত্রণার কাহিনি পরিলক্ষিত হয়। সে অন্ধকার থেকে আলোর জগতে আসার পথ তারা খুঁজে পায় না। 'অন্নদার অভিশাপে' একটি ব্যতিক্রমধর্মী গল্প। মুখ্য চরিত্র গুরুর অদৃষ্টতাড়িত জীবনে ভাগ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী কাহিনি নিয়ে গল্পটি রচিত। ধর্মান্তরের বিষয় নিয়ে রচিত এই গল্পে গল্পকারের শিল্পীসুলভ বাক্‌সংযম স্বাভাবিক ও নির্বিকার। এই স্বাভাবিকতা গল্পটিকে ভাষাগত বাঁধুনির দিক থেকে উন্নত করেছে। গল্পকারের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে গুরুর জীবনসংগ্রাম। যদিও গল্পের নাম 'অন্নদার অভিশাপে', কিন্তু গল্পকার জানেন যে, ভাগ্যরচনায় দৈবের চেয়ে মানুষের নিজের

চেষ্টার রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা। বিভিন্ন গল্পে যেভাবে তিনি ভাগ্যের নির্মম কশাঘাত চিত্রিত করেছেন, সে হিসেবে এতে জগদীশ গুপ্তের ব্যতিক্রমী মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঙ. রোমান্টিক ও কৌতুকরস-ভিত্তিক গল্প

রোমান্টিকতা ও কৌতুকরস জগদীশ গুপ্তের মেজাজের অনুকূল নয়। তারপরেও কিছু গল্পে জীবনের গভীরতম উপলব্ধিগুলোকে হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এই শ্রেণিভুক্ত গল্পগুলো হলো: 'আঠার কলার একটি' (*পাইক শ্রীমিহির প্রামাণিক*), 'মেঘাবৃত অশনি' (*মেঘাবৃত অশনি*), 'সমাপ্তির পূর্ব পরিচ্ছেদ' (*শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী*), 'জগন্নাথের যন্ত্রণা' (*উদয়লেখা*), 'মারে কেষ্ট রাখে কে' (*উদয়লেখা*), 'রানী শান্তমণি' (*উদয়লেখা*), 'জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি' (*উদয়লেখা*), 'কামাখ্যার কর্মদোষে' (*উদয়লেখা*), 'জ্যাঠানন্দ' (*উদয়লেখা*), 'পেয়িং গেস্ট' (*উদয়লেখা*), 'ব্যস্ত বাগীশ' (*উদয়লেখা*), 'অধ্রুবম নষ্টমেব হি' (*উদয়লেখা*)।

'জগন্নাথের যন্ত্রণা' জগদীশ গুপ্তের লঘু ও কৌতুকরসপ্রধান গল্পগুলোর মধ্যে একটি। কৌতুকরসের মধ্য দিয়ে গল্পটিতে জীবনযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। গল্পকার গল্পের আঙ্গিক নিয়ে নানা নিরীক্ষা করেছেন। তিনি কখনও গল্প তৈরি করেছেন চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে। কখনো বা একক সংলাপ বা মনোলগের মাধ্যমে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। চটুল ভাষারীতির সঙ্গে অলংকার সংমিশ্রিত হয়েছে নানা স্থানে। কখনও গল্পে তৈরি হয়েছে বৈঠকী ঢং। তাই এসব গল্প লেখকের serious লেখার মধ্যে অনেকটা মানসিক relief বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে। 'জগন্নাথের যন্ত্রণা' একটি ভাবপ্রধান গল্প। কখনো কখনো অতি সাধারণ ঘটনাও মানবমনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে যা তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। কিংবা উলটাটাও করে। এমন ভাবরসই গল্পটির বিষয়।

মানবজীবনের অন্ধকার দিকের বহিঃপ্রকাশ যে জগদীশ গুপ্তের লেখায় উপজীব্য, প্রকৃতির রূপ বর্ণনাতেও সেই বিষয়কেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। লঘুরসের মধ্যেও মানবচরিত্রের পলায়নপরতা, হীনম্মন্যতাকে তুলে ধরেছেন লেখক যাতে মানুষের আচরণ কার্যকারণ-সূত্রে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। জটিল তার মনোজগৎ। কখনও কেউ অভাবে অপরাধী হয়, কেউ হয় শখের বশে, আবার কেউ খামখেয়ালিপনায়। 'মারে কেষ্ট রাখে কে' এমনই একটি গল্প। সূক্ষ্ম কৌতুকরসের এই গল্পটিতে কৌতুকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সংকট, দেশ-কাল-রাজনীতিভাবনা। গল্পে স্বর্ণকার গঙ্গাধর রায়ের পুত্র অভাব না থাকা সত্ত্বেও স্বভাবদোষে দাগি চোর। 'রাণী শান্তমণি' গল্পে কৌতুকরস এবং গুরুগম্ভীর চিন্তা সংমিশ্রিতভাবে ফুটে উঠেছে। সম্পদলিপ্সায় মানুষ পশুতে পরিণত হতে পারে। স্বার্থান্ধ, কুৎসিত মানবচরিত্র এ গল্পে উল্লেখযোগ্য। পাশাপাশি বাৎসল্য রস গল্পটির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। একটি বিড়ালকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য রসমিশ্রিত পশুপ্রীতির নির্দশন বাংলা ছোটগল্পে দুর্লভ। ফিলাডেলফিয়া প্রত্যাগত ডাক্তার নীলমণি চ্যাটার্জির জ্বর নিরাময়ের ঔষধ ম্যালেরোডিনা বড় নাকি কবিরাজ হরিহর রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত 'জ্বরশনি' বড়—এই নিয়ে হাস্যরসাত্মক গল্প 'জ্বরশনির গ্রহশুদ্ধি'। নীরবে, কারো অজান্তে উপকার করার মধ্যে যে মহত্ত্ব বিদ্যমান, তা ডাঃ নীলমণি চ্যাটার্জি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন। 'কামাখ্যার কর্মদোষে' একটি নির্মল কৌতুকরস-

প্রধান গল্প। তবে হিউমারের অন্তরালে গল্পকারের কটাক্ষ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। জগদীশ গুপ্তের গল্পের পসরায় 'জ্যাঠা নন্দ' বিষয়-বৈচিত্র্যের আস্বাদ এনে দিয়েছে। কারণ শিশুমনের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবলম্বনে গল্প-রচনা বাংলা সাহিত্যে বহুল হলেও জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যে তা বিরল বললেই চলে। প্রসঙ্গত বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ তাঁদের কথাসাহিত্যে শিশুমনের বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তাদের প্রবৃত্তিকে নানাভাবে রূপদান করেছেন। তাঁদের হাতে সৃষ্টি হয়েছে কিশোর ফটিক, ভোলানাথ, তারাপদ, রাম, ইন্দ্রনাথ, অপু প্রভৃতি চরিত্র। কিন্তু 'জ্যাঠা নন্দ' গল্পের নন্দ চরিত্রটি তাদের সগোত্র নয়। এটি একটি চরিত্রপ্রধান গল্প। কিশোর নন্দের জ্যাঠামির পরিচয়দানই গল্পটির মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্পের নামকরণেও তার ইঙ্গিত রয়েছে। শিশুসুলভ দুরন্তপনা ও আত্মাভিমানবোধ নন্দের মধ্যে প্রখর। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। অভিভাবকের হৃদয়ের কোন দুর্বল জায়গায় কতটুকু আঘাত করলে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, সেটা তার নখদর্পণে। সম্ভবত লেখক কিশোর নন্দ চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকেই তার জ্যাঠামি বলে আখ্যা দিতে চেয়েছেন।

'পেয়িং গেস্ট' জগদীশ গুপ্তের প্রথম রচিত গল্প। ভাব ও ভাবনার দিক থেকে 'পেয়িং গেস্ট', *উদয়লেখার* গল্পগুলোর সমগোত্রীয়। ফলে গল্পটিকে পরবর্তী সময়ে *উদয়লেখা* গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত। বক্তার জীবনাভিজ্ঞতা এখানে বর্ণিত হয়েছে। সদ্য বিবাহিত বেকার যুবকের জবানিতে সমকালীন জীবনমানসের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পটিতে। 'ব্যস্তবাগীশ' নির্মল কৌতুক রসাশ্রিত গল্প। এর কাহিনি গড়ে উঠেছে বাতিকগ্রস্ত, ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন জনৈক ব্যক্তির একক সংলাপের মধ্য দিয়ে। ওই ব্যক্তির বাজার করতে হাটে আসা থেকে গল্পের সূচনা, বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরার পরে গল্পের সমাপ্তি। এই স্বল্প সময়ের পরিসর থেকেই চরিত্রটির কৌতুককর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকটির এই অনাস্থা, অবিশ্বাস ও বিকৃত মানসিকতার পরিচয়দানের মাধ্যমেই গল্পটিতে হাস্যরস তৈরি করেছেন লেখক। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি খুব উঁচু মানের গল্প নয়। কিন্তু গঠনশৈলীর দিক থেকে গল্পটি অভিনব। একক সংলাপের মধ্য দিয়ে গল্পটির কাহিনি বর্ণিত। ইংরেজিতে যাকে বলে Humorous dramatic monologue, গল্পের কথকের সংলাপের মাধ্যমে অন্য চরিত্রের আভাসে তা অনুভূত হবে। কথকের সঙ্গে অন্য চরিত্রগুলোর কথপোকথনের ইঙ্গিত থাকবে। কিন্তু সরাসরি তাদের কোনো সংলাপ থাকবে না। বাংলা ছোটগল্পে এই রীতির প্রয়োগ বিরল। এ দিক বিচারে এটি একটি নিরীক্ষাধর্মী ছোটগল্প।

বাছুরসমেত দুগ্ধবতী একটি কৃষ্ণগাভী কেনার পরে উকিল অখিল বাবুর কপালে যে দুর্ভোগ ঘটেছিল তারই রসাবহ কৌতুককর কাহিনি 'অধ্রুবম্ নষ্টমেব হি' গল্পটি। হাস্যরসাত্মক গল্প হলেও এর মধ্যে সমকালীন সমাজের রূঢ় সত্য তুলে ধরেছেন লেখক। অখিলবাবুর গরু কেনার কারণ বর্ণনার মধ্যেই সেসব বিষয় উঠে এসেছে। পসারবিহীন ও খ্যাতিলাভে বঞ্চিত আইনজীবীদের দুরবস্থার বাস্তব চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখক হাস্যরসের আড়ালে জীবনের নির্মম পরিণাম তুলে ধরেছেন। 'মেঘাবৃত অশনি' গল্পে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট, ব্যক্তিত্বহীন মানুষের অন্তঃসারশূন্যতা ও লঘুতা দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। 'সমাপ্তির পূর্ব পরিচ্ছেদ' গল্পে হাস্যরস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। ছাপ্পান্ন বছর বয়সী ভগীরথ দত্তের একটি দাঁত পড়ে

যাওয়ার ঘটনা দিয়ে হাস্যরসের ছলে লেখক জীবনের বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন। হৃত যৌবনের জন্য বেদনাবোধ চিরন্তন সত্য। কিন্তু বিচ্ছিন্ন দাঁতের প্রতি অতিরিক্ত মমতা গল্পটিতে কৌতুকরসের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

চ. নিষ্ঠুর নিয়তি ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ-কেন্দ্রিক গল্প

নিয়তিবাদ আসলে কী, ব্যাপারটা বোঝার জন্য কোনো দার্শনিক তত্ত্ব পর্যালোচনা ছাড়াও সাধারণভাবে আঁচ করা যায়। মানুষ কোনো এক অদৃশ্য শক্তির খেলার পুতুল। সেই শক্তির ইশারার পুতুল খেলায় জাগতিক মানুষ ভাগ্যবিড়ম্বিত সৃষ্টি। কার্যকারণবিহীন ঘটনাপ্রবাহে কখনো মানুষের জীবন ইতিবাচকতায় সুবাসিত হয়, কখনো-বা অপারগ খেদে মানুষ মাথা কুটে মরে বিপর্যস্ত ভাগ্যচক্রে, যাতে তার নিজের কোনো দায় নেই। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের আখ্যানে এমন ভাগ্যবিপর্যস্ত মানুষের হাহাকার লক্ষ করা যায়। এরূপ আখ্যানচিত্রণের কারণে কোনো কোনো সমালোচক জগদীশ গুপ্তের রচনায় নিয়তিবাদের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। নির্মম ও কার্যকারণ-শৃঙ্খল বহির্ভূত ঘটনাচিত্রণের কারণে কেউ কেউ তাঁকে নিয়তিবাদে বিশ্বাসী বলে মনে করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, লেখকের লেখায় নিয়তিবাদের উপস্থিতি থাকলেই তিনি নিয়তিবাদে বিশ্বাসী—এমন সাধারণীকরণ যুক্তিযুক্ত কি না। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিতে মানুষ সমাজের এক নিষ্ঠুর অন্ধ শক্তির খেলার পুতুল। সেই দুর্নিবার শক্তির নিষ্ঠুর প্রভাব থেকে মানুষ নিজেকে কখনো মুক্ত করতে পারে না। ওটাই জগদীশ গুপ্তের মৌল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের নিরিখে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিচার্য। সমালোচকের মতে:

> এটাই তাঁর অনিবার্য নিয়তিবাদ। কিন্তু মনে হয় যে, প্রচলিত সমাজের প্রথাসিদ্ধ ও অনড় অনুশাসনের যে জগদ্দল পাথরের ভার ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন বিকাশের পথের প্রধান অন্তরায়, যার বাধা অতিক্রমণে প্রয়াসী মানুষ চিরদিন অসহায়ভাবে অবিরত পর্যদুস্ত হচ্ছে, তাকেই শিল্পী জগদীশচন্দ্র ওই অন্ধ শক্তির রূপকে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি মানুষের আত্মশক্তিতে পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে নৈরাশ্যবাদী। তাকে নিয়তিবাদী বলা যুক্তিযুক্ত নয়। (প্রশান্ত ২০০১: ৭৯)

উপরি-উদ্ধৃত বক্তব্যের বিপরীতে হাসান আজিজুল হকের পর্যবেক্ষণ লক্ষ করা যাক:

> আসলে নিয়তিবাদ এক ধরনের হাল ছেড়ে দেবার ব্যাপার। আমার ধারণা এটা মনুষ্যপ্রকৃতি বিরোধীও বটে। গ্রীক নিয়তিবাদের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তর গল্প উপন্যাসের মূল বিষয়ের তুলনা মাঝে মাঝে করা হয়েছে বটে, কিন্তু গ্রীক অদৃষ্টবাদ যেমন মানুষের কর্মে অন্তরনিবিষ্ট জগদীশ গুপ্তর রচনায় তা নয়। তবে কি জগদীশ গুপ্তর রচনায় মানবসত্য নেই? কথাটার জবাব দিতে গেলে বলতে হয় মিথ্যার মতো সত্যও অমোঘভাবে স্থির ও অবধারিত নয়। দেশে কালে তার রূপান্তর আছে। জগদীশ গুপ্ত তাঁর কালের যে সমাজ দেখেছিলেন তার একটা আপেক্ষিক সত্য চিত্রই আমাদের দিয়েছেন। তাঁর রচনা তাঁর সময়ের সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার্য এবং সেটা করলে বলতেই হবে জগদীশ গুপ্তর সততা তুলনারহিত। (১৯৯৪: ৮৮)

উদ্ধৃতি দুটির আলোকে জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিমানস সম্পর্কে এক বাইনারি অপোজিশন আমাদের বিভ্রান্ত করে। প্রথমোক্ত উদ্ধৃতিতে লক্ষ করা গেল, সমালোচক জগদীশ গুপ্তের ব্যক্তিক বিশ্বাসের মৌলে নিয়তিবাদকে স্থাপন করেছেন, যা পশ্চাৎপদতার নিরিখে একজন মহৎ লেখকের জন্য অবমাননাকর। শেষোক্ত উক্তিতে ‘মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারানো’ আর তাঁকে ‘নিয়তিবাদে’র বাইনারি বিপরীতে দাঁড় করানোর ধারণাও বিভ্রান্তিকর। আসলে আমরা লক্ষ করেছি, জগদীশ গুপ্তের লেখকসত্তা পর্যালোচনা তাঁর কৃতির তুলনায় নিতান্ত কম হয়েছে। আর যা হয়েছে, তাতে আমাদের বিভ্রান্তির মাত্রাই বেড়েছে। আধুনিক পাশ্চাত্য বিশ্বে, এমনকি বাংলাদেশের সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কথাসাহিত্যে আমরা লক্ষ করেছি লেখক নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় পাঠককে বিভ্রান্ত না করে মানুষের প্রতিদিনকার ঘটনার একেকটি বিষয়কে নির্মোহভাবে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের উপজীব্য করেছেন, যাতে মুখ্য হয়ে ওঠেনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি দ্রষ্টা হিসেবে নিজস্ব শিল্পরীতিতে কেবল পাঠককে বাস্তবের আস্বাদ দিয়েছেন। জীবনে প্রকৃতপক্ষে যা ঘটে, সাহিত্যে তাই দেখিয়েছেন। তত্ত্ববিচারে ব্যাপাটাকে আমরা যেভাবেই দেখি না কেন, জগদীশ গুপ্তের গল্পে যে চিত্র আমরা পাই তার নিরিখে বলা যায়, সাহিত্যের মর্মে লেখক জগদীশ গুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে সেঁটে দেবার কাজটি করেননি। যেমনটা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পসফল কালজয়ী লেখকরা করেছেন। জগদীশ গুপ্ত তাঁর সাহিত্যকর্মে নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রশ্নে নির্মোহ। তিনি এখানে কেবলই চিত্রী, যেমনটা দেখেন নিজের মনের ক্যামেরায় তাই ধারণ করেন। নির্মোহভাবে তুলে ধরেন কলমের সূক্ষ্ম স্পর্শের কারুকর্মে। উক্ত বিবেচনায় হাসান আজিজুল হকের অভিমত আমরা যতটা তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, প্রথমোক্ত মত সম্পর্কে খুব সাধারণ পাঠেই আমরা দ্বিধা-ভারাক্রান্ত হই। এমন দ্বিধান্বিত পাঠ জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে নেহায়েৎ কম নয়, যেমনটা আমরা প্রথম যুগে রবীন্দ্র-প্রতিক্রিয়াতেও লক্ষ করেছি। সমালোচক হাসান আজিজুল হকের অভিমত গ্রহণ সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি, জগদীশ গুপ্তের গল্পের আখ্যান প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিবাদেরই প্রতিফলন। উক্ত বিবেচনায় ‘দিবসের শেষে’ গল্পটিকে বলা যায় কার্যকারণ-শৃঙ্খলা বহির্ভূত একটি আখ্যান। এখানে আছে নির্মম অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ। তবে এই অদৃষ্ট বা নিয়তিবাদ প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডির অদৃষ্টবাদের মতো নয়। এখানে কোনো মহৎ ব্যক্তির নির্মম করুণ পরিণতির কথা গল্পভুক্ত হয়নি। পূর্ব-নিরূপিত ধারণা আরোপের ফলে দিনশেষে ভাগ্যাহত মানুষের হারিয়ে যাওয়া, বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার গল্প এটি। ‘দিবসের শেষে’ গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রতি নাপিত, তার স্ত্রী নারানী এবং পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচুকে নিয়ে এ গল্পের প্লট নির্মিত হয়েছে। চাকরান জমিভোক্তা রতি নাপিতের ছেলে পাঁচুকে কুমিরে খাবার গল্প এটি। কার্যকারণ-শৃঙ্খলার বিপরীতে দাঁড় করানো এই গল্পে মানবজীবনের অনির্দিষ্ট ভাগ্যচক্রের নির্মম রূপ চিত্রিত হয়েছে। গল্পপাঠে মনে হতে পারে, পিতা রতির অন্ধবিশ্বাস ও তাৎক্ষণিক অবিমৃষ্যকারিতাই পাঁচুর জীবনে চরম দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। এখানে প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও প্রতিশোধপরায়ণ। আবার ব্যক্তিমানুষের জীবনে অশুভ পরিণামের অনিবার্যতার চিত্রও তিনি এঁকে গেলেন। নদীর রূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে এই অশুভ পরিণতির ইঙ্গিত পরিদৃষ্টমান:

> নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্নরৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝক ঝক করিতেছে। ... দুর্লঙ্ঘ্য তীব্র স্রোতে ছুটিয়া চলিয়াছে—এত বড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভাল করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না; যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দেশ্য বহিরাবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।—এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কত হিংসা দৃষ্টি মেলিয়া ফিরিতেছে!—রতি শিহরিয়া উঠিল। (জগদীশ ১৯৮২: ৪৩৯)

জীবনের উদ্দেশ্যহীন পরিণতির সম্ভাবনা নদীর রূপ বর্ণনায় লক্ষণীয়। এরূপ বর্ণনায় চিত্রকল্পের ব্যবহার আছে, বাগ্‌ভঙ্গিতে চমৎকারিত্ব আছে। পাশাপাশি আছে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধের উপস্থিতি। যে বিচ্ছিন্নতাবোধের সঙ্গে হয়তো জড়িত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী নৈরাশ্যবোধ। এর ফলেই যে কামদা নদীতে কেউ কোনোদিন কুমির দেখেনি, এমনকি এটা তাদের কাছে একটা হাস্যকর বিষয় রূপে গণ্য হয়, সেই কামদা নদীতে কুমিরের মুখেই গল্প শেষে প্রাণ যায় পাঁচুর। 'দিবসের শেষে' এ এক ধরনের অদৃষ্টবাদ। গল্পের অদৃষ্টবাদের এমন ধরন নিয়ে সমালোচকের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য:

> রতিকান্তর পাঁচ বছরের ছেলে সকালে উঠেই বলল, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে', এবং দিবসের শেষে তাকে কুমিরেই নিয়ে গেল। এটাকে কোনো রকমে টেনেটুনে অদৃষ্টবাদ বলা হয়তো চলে, কিন্তু এটা বলাই সঙ্গত যে, এই মানবটি একটি আবর্তনের শেষে ফুরিয়ে গেল। (গুণময় ২০১৮: ১৩১)

প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে। এই অনিবার্যতা সম্পর্কে গল্পকার সংশয়হীন। তাই তিনি পাঁচুকে কুমিরের মুখেই দিতে চেয়েছেন। মানুষের জীবনের সব শুভ প্রয়াস এক সময় ব্যর্থ হয়ে যায়—গল্পটির নিয়তিবাদ এই ধারণাটিরই ধারক। গল্পটি আমাদেরকে এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত দেয়: 'নির্মম, যুক্তিহীন ও দুর্জ্ঞেয় এক শক্তির কাছে মানুষ অসহায়। যুক্তি দ্বারা যার ব্যাখ্যা হয় না, তাকে যুক্তি দ্বারা লেখক ব্যাখ্যা করতে চাননি' (বিপ্লব ২০১৮: ২২৪)। এই আখ্যানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে মানবজীবনের করুণ অসহায়ত্বই ফুটে উঠেছে, যা নির্দোষ, প্রকৃতির কাছে ক্রীড়নক, ভাগ্যাহত মানুষের নির্মম পরিণতি। টেক্সচুয়াল ক্রিটিসিজম বা পাঠনির্ভর সাহিত্য-সমালোচনার আঙ্গিকে এর বেশি আমরা ভাবতে চাই না।

তবে জগদীশ গুপ্তের রচনার এই প্রাকৃতিকতার আড়ালে এক ভিন্ন দৃষ্টি কেউ কেউ লক্ষ করেছেন, যাকে তাঁর লেখকদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা রূপে চিত্রিত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তিনি বিপর্যস্ত মানবতার, বিপর্যস্ত নৈতিকতার যে চিত্র এঁকেছেন তা কি মানবজীবনের কোনো খণ্ড চিত্র? আপেক্ষিক, না শাশ্বত বা চিরন্তন? লেখক হাসান আজিজুল হকের পর্যবেক্ষণ থেকেই উদাহরণ নেওয়া যাক:

> তাঁর রচনা আপসহীনভাবে সত্যসন্ধানী এবং তিনি আধুনিক কালের বাংলাসাহিত্যে একজন পথিকৃৎ। তাঁর ভ্রম হয়েছিল একটাই। আপেক্ষিককে তিনি চিরন্তনের স্থান দিয়েছিলেন। স্বকালের সমাজের বদ্ধতাকে চিরস্থায়ী ধরে নিয়েছিলেন এবং ব্যাধিগ্রস্ত মানব সম্পর্কগুলিকে চিকিৎসার অতীত বলে গণ্য করেছিলেন। (১৯৯৪: ৮৮)

প্রকৃতপক্ষে কোনো শিল্পী সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। শিল্পরূপেরও কোনো নির্ভুল নিশানা নেই। পাঠক হিসেবে নেই কারো ভাবনার সীমা। যা আছে তা হচ্ছে একটা কল্পিত আদর্শ (standard)। সেই আদর্শের যদিও কোনো সামাজিক বা শৈল্পিক সীমানা নির্ধারিত নেই, প্রথাগত সমাজে শিল্পীর দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা আছে জোরেসোরে। সেই দায়ই বহন করে চলেছেন লেখক জগদীশ গুপ্ত। হাসান আজিজুল হক উত্থাপিত প্রশ্ন তেমনই একটা দায়। জগদীশ গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পের আদিপর্বের লেখক। তাঁর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের যে কাঠামো নির্মাণ করেছেন, তার সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের মেলে, আবার মেলেও না। ‘বর্ষাযাপন’ কবিতার ছত্রে ছোটগল্পের যে সংজ্ঞার্থ ও বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ করেছেন বলে বাঙালি পাঠকসমাজে কল্পনার পাখা বিস্তৃত হয়েছে, তার গাঠনিক ছাঁচে জগদীশ গুপ্তকেও মেলানো যায়। সেই ‘ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা’, ‘শেষ হইয়াও হইল না শেষ’ কিংবা অন্যবিধ চমকগুলো জগদীশ গুপ্তের গল্পেও পাই। তাঁর শিল্পীসুলভ বড়ত্ব নিয়ে উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ সমালোচকের নিজস্ব। তবে তাঁর বিভিন্ন গল্পে শেষের যে চমক, বলার যে পরিমিতি, ভাষার যে ঋজুতা, তাতে স্পষ্টত আমাদের মনে হয় তিনি তাঁর আখ্যানের বিষয়কে তাৎক্ষণিকতা দিয়েই দেখেছেন। একে চিরন্তনতা দান বা সমাজের ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করার মতো স্পষ্ট নৈতিক অবস্থান বা কাঙ্ক্ষিত সমাজদর্শিতা তাঁর মধ্যে দুর্লভ বলেই মনে হয়। লেখক হিসেবে তাঁর গুণ বা দোষ নির্ণয়ের চেয়ে আমরা কেবল তাঁর একেকটি গল্পের আখ্যানভাগে লেখক-ব্যক্তিত্বের নির্মোহ অবস্থানই দেখতে পাই। আমাদের দৃষ্টিতে গল্পের বিষয়বস্তুর নৈতিক অবস্থান থেকে নিজেকে পৃথক করতে পারার, নিজের বিশ্বাস-অবিশ্বাস গোপন করতে পারার এই সামর্থ্যই জগদীশ গুপ্তকে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্বতন্ত্র অবস্থানে আসীন করেছে।

‘তৃষিত আত্মা’ বাংলা সাহিত্যে uncanny বা রহস্যময় বা অতিপ্রাকৃত শ্রেণির গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গল্পটিতে কিছুটা ভৌতিক বিশ্বাসের কথা রয়েছে। গল্পের নামকরণ থেকেই অনুমান করা যায়, মৃতের অতৃপ্ত আত্মা তার তৃপ্তির জন্য এমন কিছু করবে যা তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে মারাত্মক অনিষ্টকর। ‘তৃষিত আত্মা’ পাঠে রবীন্দ্রনাথের ‘কঙ্কাল’, ‘নিশীথে’ বা ‘মধ্যবর্তিনী’ গল্পের কথা মনে পড়ে। মনে হয়, মানুষ প্রকৃতির বা কোনো অদৃশ্য শক্তির হাতের পুতুল মাত্র। তার কিছুই যেন করার নেই। নিয়তির এই বোধ গল্পটিতে প্রকাশিত। তাতেই মনে হয়: ‘অনন্ত প্রয়াসশীল মানুষের যন্ত্রণাকে, পরাভবকে যিনি এঁকেছেন, তিনি মানুষকে ছোট করে আঁকেননি’ (সরোজ ১৯৬১: ২৩৭)। ‘দৈবধন’ অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে বাস্তবতার মিশেলে নির্মিত একটি গল্প। এমনিভাবে ‘দৈবধন’, ‘হাড়’, ‘ভরা সুখে’ গল্পগুলোর প্লট পরিকল্পিত হয়েছে। ‘ভরা সুখে’ গল্পটির আখ্যান গৃহীত হয়েছে একটি সুখী, মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে। এই গল্পের মুখ্য বিষয় পরিবারের কর্তৃ-নারী হরিমোহিনীর আকস্মিক মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর মতো অনিবার্য একটি পরিণতি গল্পের শেষে হরিমোহিনীর জন্য অপেক্ষা করে আছে, এমন ধারণা গল্পের শুরুতেই উপলব্ধি করায় গল্পরস ক্ষুণ্ন হয়েছে। মানুষ তার দুর্ভাগ্য এড়াতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, সমাজ যখন বৈরী হয়ে ওঠে, প্রকৃতিও যেন কখনো কখনো বৈরী আচরণ করতে থাকে—এই বোধ গল্পের শুরুতেই প্রকাশ পাওয়ায় গল্পটির চমক ক্ষুণ্ন হয়েছে, শিল্পগুণ হয়েছে বিনষ্ট:

> ছোটগল্পকে যদি ‘কথাশিল্প’ বলে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে জগদীশ গুপ্ত প্রকৃত অর্থেই কথাশিল্পী। তাঁর গল্পগুলির বিভিন্ন পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও আবর্তগুলিকে নিপুণভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে শব্দ ও বাক্যের নির্মাণ, নির্বাচন ও বিন্যাস কৌশলের দ্বারা। (ব্রতী ২০১৮: ৩৮০)

প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের গল্প বিষয় ও কাঠামোগুণে বিমিশ্র শিল্পরীতির পরিচায়ক। একটি গল্প একবার মাত্র পাঠ করে এর পূর্ণাঙ্গ রহস্যোদ্ধার সম্ভব নয়। তাঁর গল্পের অভ্যন্তরে শব্দের ব্যবহারের মধ্যে আছে বিচিত্র ব্যঞ্জনার আভাস। ছোটগল্পে ঘটনার একমুখীনতা, একটি উত্তুঙ্গ মুহূর্তের নির্মাণ, আকস্মিক পরিসমাপ্তি প্রভৃতি যে কয়েকটি শর্ত পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পেও বিদ্যমান। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে জগদীশ গুপ্ত অসামান্য সাহসিকতা দেখিয়েছেন। কিন্তু গদ্যভাষার ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেছেন পুরনো প্রথাবাহিত সাধুরীতিকেই। সাধু গদ্যে দীর্ঘ ক্রিয়াপদ, তৎসম শব্দের ওজনদার শব্দভান্ডার নিয়েই তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন মতো এই পুরনো গদ্যভাষার মধ্যেই তিনি বৈচিত্র্যের সঞ্চার করেছেন। বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে প্রকাশ করতে সাহায্য নেওয়া হয়েছে নানা প্রকার আলংকারিক শব্দের। ‘শঙ্কিত অভয়া’ গল্পে অতুলের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শান্তি নৃত্য শুরু করলে তার বর্ণনা করতে গল্পকার ব্যবহার করেছেন ধ্বনির অনুপ্রাস: ‘তারপর আসিল স্থিতি, গতি, গণ্ডির ভেতর শান্তিময় পরিমণ্ডলে নিজের গভীরতম সত্তার পূর্ণ অনুভূতি আর পূর্ণাহুতি’ (জগদীশ ১৯৭৭: ১৩১)। এখানে দেখা যায় ক্রমাগত ‘ই’ বা ‘ত’ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি দীর্ঘায়িত করেছে নৃত্যের আবেশময় অবস্থাকে। একই সঙ্গে রয়েছে শব্দের পুনরাবৃত্তি: ‘পূর্ণ’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে দুটি শব্দ—‘অনুভূতি’ আর ‘আহুতি’। নৃত্যের আবেগঘন মুহূর্তে শান্তি নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরে নৃত্যের ভঙ্গিমায়। কারণ অতুলকে সে পিতাই মনে করে। অন্যদিকে প্রায় অনাত্মীয় অতুল পরিপূর্ণ নারীরূপে দেখেছে শান্তিকে, যে দেখার সামান্য সীমালঙ্ঘন হলেই সম্পর্কের সূক্ষ্ম বন্ধন ছিন্ন হবে। প্রায় একই ধরনের বর্ণনা আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *দিবারাত্রির কাব্য* উপন্যাসে। সেখানে আনন্দ তার মায়ের বন্ধু হেরম্বের সামনে নৃত্যরত হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে ভাষাগত আড়াল বর্জন করেছেন। চলিত গদ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় পরিস্থিতির বর্ণনা এখানে আছে। কিন্তু স্পষ্ট ভাষা ব্যবহারে গদ্যের সৌন্দর্য নষ্ট হবার শঙ্কায় জগদীশ গুপ্ত তৎসম শব্দের আড়ালে যৌনাকাঙ্ক্ষা, দেহবাদী মানসিকতাকে প্রকাশ করেছেন। ‘অরূপের রাস’ গল্পে রানুকে বিবাহোত্তর জীবনে প্রবেশ করার পর প্রথমবার দেখার অনুভূতি নায়কের চোখে ব্যক্ত হয়েছে এভাবে:

> সেদিন অপূর্ব অননুভূতপূর্ব একটা অসামান্য অনুভূতির অতিশয় বেগবান হিল্লোলে আমি সহসা পূর্ণ হইয়া গেলাম—শুষ্ক নদী যেমন বন্যার জলে দেখিতে দেখিতে পূর্ণ হইয়া যায়। ... এবং সেই মুহূর্তেই আমার উল্লসিত চোখের সম্মুখে জলস্থল অন্তরীক্ষে একটা লোহিত মায়াঞ্জন ব্যাপ্ত হইয়া গেল। (জগদীশ ১৯৭৭: ১২১)

এখানে রানুর প্রতি দ্রষ্টার মনের ভাব ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দ্বারা কলুষিত। তা সরাসরি ব্যক্ত করলে শ্লীলতার মাত্রা পেরিয়ে যায়। চোখের দৃষ্টির কথা এখানে ব্যর্থ হয়েছে রূপকের

সাহায্যে। এর মধ্যে আছে হৃদয়ের উপচে পড়া আবেগ। কিন্তু প্রকাশের পথ রুদ্ধ, তাই অলংকৃত তৎসম শব্দের দ্বারা লেখক তাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

এ রকম আরো একটি বর্ণনা আছে 'দিবসের শেষে' গল্পে। সেখানে পাঁচ বছরের শিশু পাঁচুর মৃত্যুভয়ের চাপা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে:

> নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন রৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝকঝক করিতেছে। এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য কত হিংসা দ্রংষ্টা মেলিয়া ফিরিতেছে। (জগদীশ ১৯৮২: ৪৩৮)

মৃত্যুভয় গল্পের প্রধান এবং একমাত্র মুহূর্ত। রতি নাপিতের চোখ দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। 'নি' উপসর্গের প্রাচুর্য রয়েছে এই অংশে। 'নিস্তরঙ্গ', 'নিঃশব্দ', 'নিদারুণ', 'নিষ্করুণ' ইত্যাদি শব্দ একই সাথে ব্যবহারে নদীর পরিবেশে যেন ঝড় ওঠার আগের মুহূর্ত তুলে ধরেছেন লেখক। পাশাপাশি রয়েছে উপমার ব্যবহার। নদীর জলরাশি উপমিত হয়েছে শানিত অস্ত্রের সঙ্গে। এই গল্পের শেষে কুমির পাঁচুকে টেনে নিয়ে যায়। ভাষা এখানে এই আখ্যানের ভাববস্তুর পরিপূরক হয়েই দেখা দিয়েছে। জগদীশ গুপ্তের লেখা ছোটগল্পগুলোতে সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত শব্দবিন্যাস-কৌশল একরৈখিক সূত্রের মতো সমস্ত ছোট ছোট ঘটনাকে সংযুক্ত করে। যে কারণে গল্পের ঘটনা ও চরিত্র পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যেতে সমর্থ হয়। যেমন 'শঙ্কিত অভয়া' গল্পের নামের মধ্যে আছে বিরোধাভাস। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অর্থযুক্ত শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে গল্পকার গল্পটির নামকরণ করেছেন। 'অভয়া' অর্থাৎ যে নারী ভয় পায় না, তারই ভয় পাওয়ার গল্প এটি। সম্পূর্ণ গল্পে একাধিকবার তার সম্পর্কে ভয়সূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন গল্পকার। যেমন 'ভীতি', 'আতঙ্ক', 'ভয়', 'শঙ্কা', 'ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি। একই অনুভূতি প্রকাশক এসব শব্দের মাধ্যমে গল্পটিকে লেখক পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছেন। আবার কখনো কখনো গল্পে একই শব্দ দুইবার দুই ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'চার পয়সায় এক আনা' গল্পটির কেন্দ্রে আছে দুটি শব্দ 'আনা' এবং 'আনি'। গল্পের শুরুতেই তার ইঙ্গিত: 'রোজ আনে রোজ খায়, এ কথা এদের সম্বন্ধে বলা চলে, কিন্তু এরা রোজ যাহা আনে তাহা প্রচুর নয়' (জগদীশ ১৯৭৭: ১৫৮)। অর্থাৎ এখানে আনা মানে নিয়ে আসা। এভাবে গল্পটিতে একদিন 'এক আনা' পয়সা আবিষ্কৃত হয়। সেই আনাকে নিয়ে বিবাদ চরমে ওঠে। প্রচলিত উচ্চারণে আনা পয়সাকে বলা হয় 'আনি'। 'শশীও দেখিল, বিশুও দেখিল, তাহা সোনা নয়, রূপা নয়, মোহর নয়, একটা আনি' (জগদীশ ১৯৭৭: ১৬২)। এই আনিটি তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল এবং আনিটির অধিকার নিয়ে কলহই গল্পের বিষয়বস্তু। শেষ পর্যন্ত:

> কাশী আনিটাকে থ্যাঁতলাইয়া বিকৃত আর অকর্মণ্য করিয়া সেটাকে লইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া দিয়া শূন্যে কোন গহনে পাঠাইয়া দিল তাহার কিছুমাত্র উদ্দেশ রহিল না। (জগদীশ ১৯৭৭: ১৬৭)

একই শব্দের পরিবর্তিত রূপ ব্যবহার করে জগদীশ গুপ্ত যে বিশেষ শব্দবিন্যাস-কৌশল তৈরি করেছেন তার ইংরেজি পারিভাষিক নাম lexical Cohesion, বাংলায় শব্দকোষগত সংসক্তি। জগদীশ গুপ্ত গল্পের আখ্যানক্রমকে উত্তেজনা-উৎকণ্ঠায় ভরিয়ে রাখতে আখ্যান-বয়ানের ক্ষেত্রে এই কৌশলটি ব্যবহার করেছেন। আবার কখনো এই উৎকণ্ঠা বজায় রাখতে তিনি সাহায্য নেন কিছু কথনশৈলীর, যেগুলো আখ্যানের ঘটনাক্রমকে ধীরে ধীরে উন্মোচন করে, যার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করা হয় চরিত্র অথবা ঘটনাপুঞ্জের অন্তর্গূঢ় রহস্য। এই কৌশলটির ইংরেজি পরিভাষাগত নাম হলো proform। যেমন:

> এটাও হত্যা-আহার্যে বিষ মিশাইয়া নয়, গলায় ছুরি দিয়া নয়—আইনে তার সাজা নাই—তবু এটা হত্যাই। স্বাভাবিক মৃত্যু, তবু এ মরায় আর স্বাভাবিক মরায় যে কত প্রভেদ, তাহা যে মরে, সেই কেবল জানে। (জগদীশ ১৯৭৭: ১৩৯)

‘হাড়’ গল্পের শুরুতেই এই বর্ণনাটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে যে ‘হত্যা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো একটি তথ্য। পরে বিভিন্ন রকম নেতিবাচক শব্দের ব্যবহারে তথ্যটিকে আরো বিস্তৃত করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। অনেকগুলো নেতির ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যের প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টিকে বলে cataphora। হত্যার বিষয়টি যে প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবে হত্যা নয়, তার পুরোটাই যে মানসিক প্ররোচনা, সেটা বোঝাতে গিয়ে লেখক একাধিক negation বা নেতিবাচকতার সাহায্য নিয়েছেন। যেমন:

> ‘বিষ মিশাইয়া নয়’, ‘ছুরি দিয়া নয়’, ‘সাজা নাই’ ইত্যাদি। একই গল্পে আরো কয়েকটি জায়গায় নেতিবাচকতা ব্যবহার করে আখ্যানের উৎকণ্ঠা বজায় রাখা হয়েছে। যেমন: ‘কণ্ঠের ভেতর কেমন একটা কঠিন শব্দ হইল–পৃথিবীর বায়ু নাই—সম্মুখে আলো নাই—ক’টি মুহূর্ত। (জগদীশ ১৯৭৭: ১৪৪)

এই ‘নাই’ নামক নেতিবাচকতার দ্বারা পরবর্তী মুহূর্তের বর্ণনাকে আরো গতিশীল করে তোলা হয়েছে। এভাবে আরো বেশ কিছু গল্পে একটি প্রাথমিক তথ্যমূলক শব্দকে ব্যাখ্যা করতে বা বিশেষায়িত করতে তার সঙ্গে আরো শব্দ সংযোজন করে গল্পকার সেটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে লেখক কোনো কোনো সময়ে আগের বাক্যাংশটির পুনরাবৃত্তি করেছেন। অনেকগুলো ইতিবাচক বা নেতিবাচক বাক্যখণ্ডের মধ্য থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়ার যে বাক্‌কৌশল, সেটি সর্বপ্রথম অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ব্যবহার করেন প্রমথ চৌধুরী। যাকে সহজে বলা যেত তাকে অনেক আবরণের মধ্যে ঢেকে রাখার এই রীতির কারণে প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের উত্তরসূরী হিসেবে জগদীশ গুপ্তকে চিহ্নিত করা যায়। যদিও প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধের যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে এই গদ্যশৈলী ব্যবহার করেছেন। আর জগদীশ গুপ্ত এ ভাষাশৈলীকে গল্পের ঘটনাক্রমের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেছেন। এছাড়া চরিত্রগুলোর জটিল এবং অস্বাভাবিক মানসিকতার উন্মোচন করার ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র ভাষার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। উদাহরণস্বরূপ ‘পয়োমুখম’ গল্পের কথা বলা যায়। এই গল্পে পুত্র ভূতনাথকে বারবার বিবাহ দিয়ে পিতা কৃষ্ণকান্ত পণের টাকার লোভে নির্বিকারভাবে পুত্রবধূদের হত্যা করতে থাকেন। এখানে জটিল মনস্তাত্ত্বিক স্তর বোঝাতে গল্পের শুরুতে ভাষা এমন: ‘কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে’ (জগদীশ ১৯৮২: ৪৮০)।

ভূতনাথের প্রথম স্ত্রী মণির মৃত্যুর পরে 'কলাপে'র প্রসঙ্গ এভাবে লিখিত হয়েছে: 'কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মতো অসহ্য হইয়া রহিল' (জগদীশ ১৯৮২: ৪৮৪)। দ্বিতীয় স্ত্রী অনুপমার সঙ্গে বিবাহের পর এর উল্লেখ হয়েছে এভাবে: 'ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে' (জগদীশ ১৯৮২: ৪৮৫)। ভূতনাথের মানসিকতার পরিবর্তন এবং এই দুটি গ্রন্থের উল্লেখ আরো একবার আছে অনুপমার মৃত্যুর পরে: 'ভূতনাথের কলাপ মুগ্ধবোধ এবং পরবর্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আলমারিতে যাইয়া উঠিয়াছে' (জগদীশ ১৯৮২: ৪৮৮)। আবার লেখক ভূতনাথের তৃতীয় বিবাহের সময় অথবা তারপরে কলাপের উল্লেখ করেননি। এই অনুল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, ভূতনাথের মানসিক পরিবর্তনের স্তরগুলো সম্পন্ন হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এই গ্রন্থ দুটির উল্লেখ key-word-এর মতো, যা গল্পের অন্তর্গত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূচক। এভাবে জগদীশ গুপ্ত তাঁর ছোটগল্পের চরিত্রের মনকে শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্মোচন করেছেন। জগদীশ গুপ্তের গল্পের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের গদ্য থেকে খুব দূরবর্তী নয়। কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু এবং ভাবরীতি সমকালীন সাহিত্যধারা থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। চরিত্রের অন্তর্লোকের আদিম জৈবপ্রবৃত্তি অঙ্কনে জগদীশ গুপ্ত সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভাষা ব্যবহারে তিনি একেবারে অনাবৃত নন। ভাষাকে তিনি গল্পকথনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ফলে জগদীশ গুপ্তের ভাষা হয়েছে ব্যঞ্জনাময়। শব্দ ব্যবহারে তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে গল্পের বিষয়বস্ত এবং রচনাশৈলী উভয় দিক থেকে তাঁর নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে বাংলা ছোটগল্পে জগদীশ গুপ্তকে এক পৃথক ধারার সূচনাকার বলা যেতে পারে।

মানবজীবনের অন্তর্নিহিত সংকট জগদীশ গুপ্তের গল্পের প্রধান কৌতূহলের বিষয়। গ্রাম বা আধা শহরের মানুষের গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনি তাঁর বহু গল্পের বিষয়বস্তু। নানা প্রতিক্রিয়ায় কেউ পাগল হয়ে গিয়েছে, সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেছে কেউ, এমন চরিত্র নিয়েও তাঁর গল্প রয়েছে। কিন্তু এরা কেউই জগদীশ গুপ্তের অভিজ্ঞতা বা পরিচিত গণ্ডির বাইরের মানুষ নয়। লেখক জগদীশ গুপ্ত ব্যক্তিগত নিষ্ক্রিয়তায় মানুষ এবং সামাজিক পরিচয়কে যথাসম্ভব তথ্যভিত্তিক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে 'রিয়ালিজম' এবং 'ন্যাচারালিজম' বলে যে দুটি আলাদা তত্ত্ব পাওয়া যায়, তার উভয়টি দ্বারাই জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্প ব্যাখ্যা করা যায়। বস্তু বা প্রকৃতিবিশ্বের বা জগৎ-জীবনের যথাযথ রূপায়ণকে 'রিয়ালিজম' বলে। এই 'রিয়ালিজমেরই' আরো সূক্ষ্ম পর্যায় 'ন্যাচারালিজম'। বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হয়ে জৈবপ্রকৃতির নিশ্ছিদ্র প্রতিরূপ বিশ্লেষণকে বলা যেতে পারে 'ন্যাচারালিজম'। জগদীশ গুপ্ত কলেজে পড়াকালীন এবং পরবর্তী সময়ে নানা বইপুস্তক পাঠ থেকে সাহিত্যের এসব আন্দোলন সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছিলেন বলে তাঁর চিঠিপত্রে উল্লেখ আছে। কিন্তু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বা এসব আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর গল্পে তিনি তত্ত্বগুলোর প্রতিষ্ঠা করেননি। অথচ প্রকৃত ন্যাচারালিস্ট শিল্পী বলতে বাংলা সাহিত্যে যদি কারো নাম উল্লেখ করতে হয় তবে প্রথমেই ধরতে হবে জগদীশ গুপ্তকে। কারণ জগদীশ গুপ্ত সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন, মানুষের জৈবসত্তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। প্রেম জগদীশ গুপ্তের চোখে প্রধানত মানুষের জৈবিক তাড়নার বাইরে অন্য কিছু নয়। আর

তাই তিনি ছোটগল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে মানবমনের নির্জ্জান অংশের নগ্ন উন্মোচন ঘটিয়েছেন। মানুষ তার মনের নির্জ্জান স্তর দ্বারা পরিচালিত হয়, সচেতন মন সেখানে অসহায়, এই বোধ লেখককে গল্পগুলোর চরিত্রনির্মাণে নিস্পৃহ করে তুলেছে। জগদীশ গুপ্তের গল্পের চরিত্রগুলোর মনের এই জটিল অবস্থাকে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সামাজিক মানুষের দিকে তিনি যখন লক্ষ করেছেন, তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক চেতনা স্পষ্ট না হয়ে মানসিক গঠন মুখ্য হয়ে উঠেছে। এখানেও আমরা উত্তরকালের সাহিত্যতাত্ত্বিক রোঁলা বার্থের টেক্সটের ধারণার সঙ্গে মেলাতে পারি, যেখানে নির্দিষ্ট সাহিত্যকর্ম রচনার পর তিনি লেখকের মৃত্যু ঘোষণা করেছেন। আবহমান সংস্কারের ধারায় সমকালীন বাংলার সমাজ ও জীবনে যে নীতি-নৈতিকতার আবহ গড়ে উঠেছিল, জগদীশ গুপ্তের গল্পের চরিত্র সেসব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের কাহিনি-কাঠামো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রথাগত হলেও চরিত্রগুলোর মনোভঙ্গি অভিনব। ফলে তাঁর গল্পগুলোকে প্রচলিত এবং নিরীক্ষাধর্মী ধারার একরকম মিশেল বলা যায়। কখনো কখনো জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট চরিত্রকে অদৃশ্য নিয়তির নির্মম শিকার হতে দেখা যায়। তবে এই নিয়তিকে গ্রিক অদৃষ্টবাদ, ভারতীয় ভাগ্য বা শেক্সপিয়রের নিয়তিবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এ হলো স্থানীয়ভাবে পরিদৃশ্যমান অসহায় মানুষের ঐতিহ্যগত জীবনচক্র। কাউকে, কোনো কিছুকে দায়ী না করে কার্যকারণহীনভাবে যে হিংস্র অদৃষ্টশক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তার দিকে তিনি ইশারা করেছেন। আমাদের বর্তমান গবেষণাকর্মটিতে এই সমস্ত বিষয়ের ওপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং কল্লোল গোষ্ঠীর সমকালে লেখনী ধারণ করেও কেবল নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে জগদীশ গুপ্ত সবার থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার সাহিত্যের কিছুটা মিল আছে। তবে জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রজ লেখক বলে তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হবার ব্যাপার এখানে অমূলক। ভিন্ন মাত্রার এই গল্পকার সমকাল বা উত্তরকালে তেমন খ্যাতি বা জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করতে না পারলেও মানুষের প্রবৃত্তিগত সত্যকে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করে জগদীশ গুপ্ত বাংলা ছোটগল্পে তাঁর স্বতন্ত্র আসন তৈরি করেছেন।

সহায়কপঞ্জি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯৫৩)। *কল্লোল যুগ*। কলকাতা: ডি. এম. লাইব্রেরী।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

গুণময় মান্না (২০১৮)। 'জগদীশ গুপ্ত: বৈনাশিকের জীবনদর্শন ও শিল্পপ্রতিমা', *উজাগর* জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা চতুর্দশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় যৌথ সংখ্যা (উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত)। হাওড়া।

জগদীশ গুপ্ত (১৯৮২)। *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী* ১ম খণ্ড (নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।

জগদীশ গুপ্ত (১৯৭৭)। *জগদীশ গুপ্তর গল্প* (সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

জগদীশ গুপ্ত (১৯৮২)। 'পত্র গুচ্ছ', *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী* (নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।

প্রবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় (২০০৯)। *জগদীশ গুপ্তর কথাসাহিত্য: ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে*। কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনা।

প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় (২০০১)। *কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত*। কলাকাতা: এডুকেশন ফোরাম।

বিপ্লব চক্রবর্তী (২০১৮)। 'নৈরাশ্য ও জগদীশ গুপ্তের সাহিত্য', *উজাগর* জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা চতুর্দশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় যৌথ সংখ্যা (উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত)। হাওড়া।

বীরেন্দ্র দত্ত (২০১২)। 'জগদীশ গুপ্ত: মানব ভাগ্যের এক নিঃসঙ্গ নিরাসক্ত কথাকার', *জগদীশ গুপ্ত: জীবন ও সাহিত্য* (সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত)। কলকাতা: বঙ্গীয় সহিত্য সংসদ।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৯৮৮)। *জগদীশ গুপ্তের গল্প: পঙ্ক ও পঙ্কজ*। ঢাকা: ফুলদল প্রকাশনী।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫)। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস* (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত)। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৮২)। 'লঘু-গুরু উপন্যাসের রবীন্দ্র-কৃত সমালোচনা', *জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী* (নিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত)। কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।

সরকার আবদুল মান্নান (২০০১)। *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৬১)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

হাসান আজিজুল হক (১৯৯৪)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

Wells, H. G. (1899). *A Story of Days to Come*. London: The Pall Mall Magazine.

Zola, Emile (1964). *The Experimental Novel* (Translated from French by Belle M. Sherman), New York: Haskell Publishing House.

Patea, Viorica (2012). *The Short Story: An overview of the History and Evolution of the Genre* (Edited). Amsterdam: Rodopi.